শহীদুল জহির

# ডলু নদীর হাওয়া ও অন্যান্য গল্প

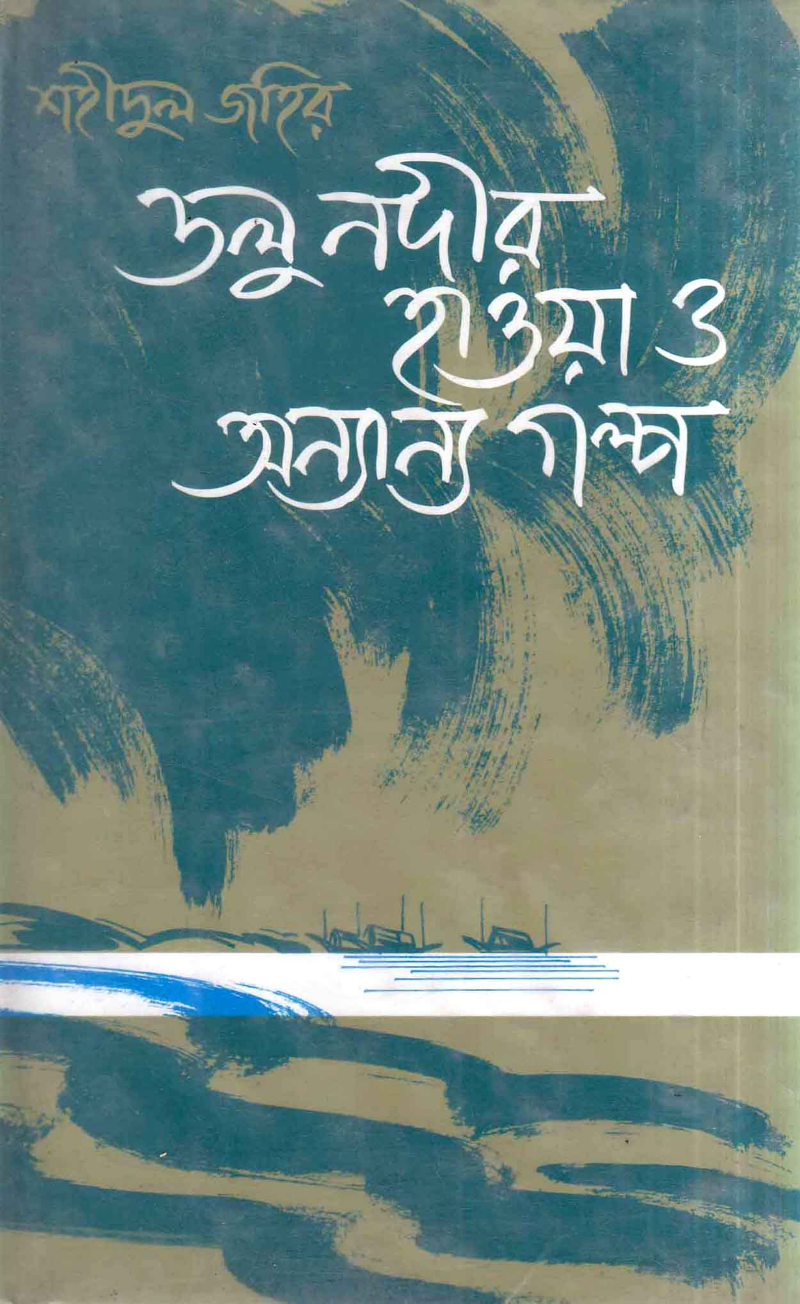

## সূচিপত্র

কোথায় পাব তাকে ৯
আমাদের বকুল ২৪
মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা ৪০
ইন্দুর-বিলাই খেলা ৫৬
প্রথম বয়ান ৮১
ডলু নদীর হাওয়া ৯৬
আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস ১১৩

# কোথায় পাব তারে

দক্ষিণ মৈশুন্দি, ভূতের গলির লোকেরা পুনরায় এক জটিলতার ভেতর পড়ে এবং জোড়পুল ও পদ্মনিধি লেনের, ওয়ারি ও বনগ্রামের, নারিন্দা ও দয়াগঞ্জের লোকেরা তাদের এই সঙ্কটের কথা শুনতে পায়; তারা, ভূতের গলির লোকেরা বলেঃ

আমরা পুনরায় আব্দুল করিমের কথায় ফিরে যেতে চাই, কারণ কয়েকদিন থেকে আমরা মহল্লায় শুনতে পাচ্ছিলাম যে, সে ময়মনসিং যাচ্ছে; কিন্তু আমরা তার এই কথাকে গুরুত্ব না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। তখন একদিন বৃহস্পতিবার বিকালে আমাদের মহল্লা, ভূতের গলির ৬৪ নম্বর বাড়ির মালিক আব্দুল আজিজ ব্যাপারি ঠোঙ্গায় করে গরম ডালপুরি কিনে ফেরার পথে আব্দুল করিমের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং সে বলে, আহো মিঞা, ডাইলপুরি খায়া যাও।

আব্দুল করিমের হঠাৎ করে ডালপুরি খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করতে লজ্জা লাগে এবং সে বলে যে, ডালপুরি খেলে তার বুক জ্বালা করে; কিন্তু আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তার কথায় পাত্তা না দিয়ে বলে, আহো আহো, মজার জিনিস, তুমিতো খালি নিজেরে লয়া থাক!

তখন আব্দুল করিমকে মেনে নিতে হয়, সে আজিজ ব্যাপারির ঘরের ভিতরে ঢুকে ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডালপুরি খায় এবং বলে, ডাইলপুরির মইদ্দে ডাইল নাইকা, হুদা আলু!

আঃআঃব্যাপারি : হঁ। ডাইলের দাম বাইড়া যাইতাছে কেমুন, দেখ না!

আঃকঃ : আপনের লাইগা ডাইল লয়া আমুনে।

আঃআঃব্যাপারি : কইথন?

আঃকঃ : আমি মৈমনসিং যাইতাছি বেড়াইতে।

তারপর আব্দুল আজিজ ব্যাপারি যখন জিজ্ঞেস করে, ময়মনসিং তার কি কাজ, সে বলে যে, সে আসলে আকুয়া যাচ্ছে; এবং আব্দুল আজিজ ব্যাপারি যখন আকুয়া কোথায় তা বুঝতে পারে না, সে বলে যে, সে আসলে ফুলবাড়িয়া যাবে। তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি যখন ফুলবাড়িয়া কোথায় তাও বুঝতে ব্যর্থ হয়, সে বলে যে, ময়মনসিংয়ের কাছেই একটা জায়গার নাম আকুয়া এবং আকুয়ার কাছেই ফুলবাড়িয়া। এই কথা শুনে আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তাকে আর একটা ডালপুরি অথবা আলুপুরি দেয়, আব্দুল করিম দ্বিতীয় পুরিটা খায়, খেতে খেতে সে পুনরায় বলে, এই হালারা আলু দিয়া ডাইলপুরি বানায়, ডাইলের দাম বাইড়া যাইতাছে, আপনের লাইগা আমি ডাইল লয়া আমুনে।

আঃআঃব্যাপারি : মৈমনসিংথন?

আঃকঃ : হুঁ, ক্যালা!

আঃআঃব্যাপারি : মৈমনসিং তুমার কি কাম?

আঃকঃ : আমার বন্দু আছে, বেড়াইবার যামু।

আঃআঃব্যাপারি : তুমার বন্দু মৈমনসিং!

আঃকঃ : ক্যালা, থাকা পারে না?

আব্দুল করিম তখন অবধারিত চক্করের মধ্যে পড়ে যায়, আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তাকে ছাড়ে না, সে তার হাতে ঠোঙ্গার শেষ পুরিটা তুলে দিয়ে বলে, কওতো ব্যাপারটা কি?

আঃকঃ : না, এমনেই। আমারে কইলো আমাগো বাইতে বেড়াইতে যাইয়েন; ভাবলাম কইছে যখন বেড়ায়া আহি গা।

আঃআঃব্যাপারি : মৈমনসিং তুমি বন্দু পাইলা কই?

আঃকঃ : পাইলাম, একদিন মহাখালি বাস স্ট্যান্ডে গেছিলাম, বাস স্ট্যান্ডে কথা হইলো, কইলো, মৈমনসিং বেড়াইতে আইসেন।

আমরা মহল্লার লোকেরা, সেদিন রাতে আমাদের দিবসের কর্ম শেষে ক্লান্ত-অবসরে আব্দুল করিমের ময়মনসিং যাওয়ার সর্বশেষ খবর শুনি এবং বলি, পোলাটা হালার ভোদাই, এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, খোরশেদ আলমের এই বেকার ছেলেটার মানুষ হতে পারার আর সম্ভাবনা নাই। পরদিন শুক্রবার জুম্মা নামাজের পর মহল্লায় আলি আকবরের সঙ্গে তার কথা হয় এবং আমরা তা জানতে পারি; আলি আকবর রহমতগঞ্জে আড়ৎদারি করে, জুম্মা নামাজ শেষে বাসায় ফেরার সময় পথে আব্দুল করিমের সঙ্গে তার দেখা হয়, এবং সে বলে, কি মিঞা আব্দুল করিম, তুমি নিহি মৈমনসিং যাইতাছ?

আঃকঃ : হুঁ, চাচা- আস সালামালেকুম।

আঃআঃ : ক্যালা, কি কাম তুমার মৈমনসিং, ধান্ধা কি?

আঃকঃ : না, এমনেই, কুনো কাম নাই, মনে করলাম ঘুইরা আহি।

আঃআঃ :হুদাহুদি ঘুরবার যাইবা!

আঃকঃ : হঁ। আপনে এইবার কি রাকবেন?

আঃআঃ : কি রাখুম?

আঃকঃ : না, কইতাচি আড়ৎ-এ এইবার কি বান্ধাই করবেন?

আলি আকবরের মেজাজ খারাপ হয়, সে বলে যে, তার আড়ৎ-এর কারবারে গণ্ডায় গণ্ডায় জিনিস বান্ধাই করা থাকে, এবং তখন আব্দুল করিম তাকে আখের গুড় বাঁধাই করার পরামর্শ দেয়। সে বলে, গুড় বান্দাই করেন, আমি ফুলবাইড়া যাইতাছি, আপনের লাইগা আউখা গুড় লয়া আমুনে।

আঃআঃ : তুমি না কইলা মৈমনসিং যাইতাছ?

আঃকঃ : হঁ, মৈমনসিংথন যামু আকুয়া, আকুয়াথন ফুলবাইড়া। ফুলবাইড়ায় ভাল গেণ্ডারি হয়, গেণ্ডারিথন ভাল আউখা গুড় হয়; আপনের লাইগা গুড় লয়া আমুনে।

আমাদের মনে হয় যে, আইএ পাশ বেকার এবং অলসের রাজা আব্দুল করিম আসলে মহল্লার লোকের সঙ্গে খেলা করে, সে তার পিতার ক্রমাগত অভিযোগ এবং গালমন্দের মুখে দিশাহারা হয়ে এই কায়দা বের করে; তার এইসব কথার কোন মানে নাই, সে জীবনে কোথাও যায় নাই এবং যাবে না। তখন আর এক বৃহস্পতিবারে সে পুনরায় আব্দুল আজিজ ব্যাপারির দেখা পায়। আব্দুল আজিজ ব্যাপারি সন্ধ্যায় পুনরায় ডালপুরি কিনে বাড়ি ফেরার সময় আব্দুল করিমকে দেখে।

আঃআঃব্যাপারি : কি তুমি অখনতরি মহল্লায় আছ?

আঃকঃ : থাকুম না ক্যালা!

আঃআঃব্যাপারি : তুমি না মৈমনসিং যাও!

আঃকঃ : যামু।

আঃআঃব্যাপারি : আমার লাইগা ডাইল আনবা?

আঃকঃ : আপনে কইলে আনুমনে।

আঃআঃব্যাপারি : আমিতো মিঞা আড়ৎদারি করি না, দুকানদারি করি।

আঃকঃ : আড়ৎদারি করন লাগে নিহি? খাটের নিচে ফালায়া থুইবেন, পরে বেচবেন।

তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তাকে ডালপুরি খেয়ে যাওয়ার কথা বলে, কিন্তু আব্দুল করিমের পুনরায় লজ্জা করে এবং আব্দুল আজিজ ব্যাপারি সাধে, আহো আহো আলুপুরি হইলেও খাইতে ভাল। আব্দুল করিম তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাসায় ঢুকে প্লাস্টিকের বেতের চেয়ারে বসে আলুপুরি খায় এবং কথা বলে।

আঃকঃ : আপনে কইলে আপনেরে ডাইল আইনা দিবার পারি, আমিতো যামুই বেড়াইবার লাইগা, আহনের সুময় লয়া আমুনে দুই/চাইর মণ।

আঃআঃব্যাপারি : তুমার বাপেরে কও না ক্যালা?

আঃকঃ : লাভ নাইকা।

আঃআঃব্যাপারি : ক্যালা?

আঃকঃ : মিল খায় না।

মহল্লায় তারপরেও আমাদের মনে হয় যে, আব্দুল করিম আসলে বদমায়েশি করছে; সে শেষ পর্যন্ত কাউকে ঠকাবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে না পারলেও আমাদের মনে হয় যে, তার আচরণের ভেতর চালাকি আছে এবং আব্দুল আজিজ ব্যাপারি যখন তার পিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তখন চালাকির বিষয়টা মনে হয় পরিষ্কার হয়ে যায়, তার তখন আসলে জবাব দেয়ার মত কিছু থাকে না। কিন্তু তারপরেও আমরা সম্ভবত নিশ্চিত হতে পারি না, কারণ পরবর্তী শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর রায়সা বাজারের হোটেল মালিক বাবুল মিঞার সঙ্গে তার কথা হয়, বাবুল মিঞাই তার সঙ্গে প্রথম কথা বলে ফাঁদে পড়ে। বাবুল মিঞা যখন তার ময়মনসিং যাওয়ার কথা জানতে চায়, সে বলে যে, সে দুই/চার দিনের মধ্যেই যাবে এবং তারপর আব্দুল করিম পুরাতন প্রসঙ্গে আসে।

আঃকঃ : হুনলাম ডাইলের দাম নিকি বাইড়া গেছে, আপনেরা অখনে আলু দিয়া ডাইলপুরি বানান!

বাঃমিঞা : হঁ, আলু দিয়াই বানাই, কিন্তু আলুর দামওতো হালায় কম না!

আঃকঃ : আমিতো মৈমনসিং যাইতাছি, আপনে কইলে আপনের লাইগা আলু লয়া আমুনে দুই/চাইর/দছ মণ।

বাঃমিঞা : আরে না, এত আলু দিয়া কি করুম!

আঃকঃ : ক্যালা, আপনের হোটেলে আলু লাগে না?

বাঃমিঞা : লাগে, আমিতো পাইকারি কিনি পড়তা পইড়া যায়।

আঃকঃ : কিন্তু আমি ফুলবাইড়া যাইতাছি, ওইখানে ভাল আলু হয়, আপনে কইলে আপনের লাইগা আমি আদ্দেক দামে আলু আইনা দিমুনে।

তখন এই চাপের মুখে বাবুল মিঞা তার কৌশল বদল করে।

বাঃমিঞা : তুমি মৈমনসিং যাইতাছ ক্যালা?

আঃকঃ : কাম নাই, বয়া রইছি, ভাবলাম ঘুইরা আহি।

বাঃমিঞা : কাম নাই! বাপের লগে দুকানে বহ না ক্যালা?

আঃকঃ : নাটবল্টুর দুকানদারি করুম না। আমি অন্য ব্যবসা করবার চাই, কিন্তু আব্বায় রাজি না।

আমরা যখন বাবুল মিঞার সঙ্গে আব্দুল করিমের এই আলাপচারিতার কথা শুনি আমাদের এই প্রথমবারের মত মনে হয় যে, আব্দুল করিম হয়তো এক ধরনের জীবিকার কথা ভাবছে; আমরা অবশ্য একেবারে নিশ্চিত হতে পারি না, কারণ, খামখেয়ালি ও অকর্মণ্য আব্দুল করিমের কিছু করতে পারার বিষয় আমাদের একেবারেই বিশ্বাস হতে চায় না। এবং দশ/পনর/বিশ দিন পরেও আমরা যখন তাকে মহল্লায় দেখি আমাদের পুনরায় মনে হয় যে, এটা তার এক ধরনের খেলাই; অথবা হয়তো সে এই সবকিছুর দ্বারা তার পিতাকেও বোঝানোর চেষ্টা করে যে, সে নিষ্কর্মা হয়ে থাকতে চায় না। কিন্তু তার ময়মনসিং যাওয়ার খবর আসে না, সে মহল্লাতেই থেকে যায়; আমাদের মনে হয় যে, হয়তো আব্দুল আজিজ ব্যাপারি ডাল কিনতে না চাওয়ায় এবং আলি আকবর আখের গুড় কিনতে না চাওয়ায় অথবা বাবুল মিঞা আলু কিনতে না চাওয়ায় তার ময়মনসিং যাওয়া হয় না। তখন ৬৪ নম্বর বাড়ির আব্দুল আজিজ ব্যাপারির সঙ্গে তার পুনরায় দেখা হয় এবং আব্দুল আজিজ ব্যাপারি পুনরায় তাকে ডালপুরি খাওয়ার দাওয়াত দেয়।

আঃকঃ : আপনে এত ডাইলপুরি খান ক্যালা?

আঃআঃব্যাপারি : আর কি খামু? বাপ-দাদায় খায়া গেছে, আমিও খাই!

আঃকঃ : ডাইলপুরির মইদ্দে হুদা আলু, আপনেরে কইলাম ডাইল আইনা দেই!

আঃআঃব্যাপারি : মৈমনসিং থন ?

আঃকঃ : হঁ।

আঃআঃব্যাপারি : তুমি যাইবা কবে?

আঃকঃ : যামু, দেখি।

আঃআঃব্যাপারি : কবে?

আঃকঃ : যামু, মনে করছিলাম আপনেগো লাইগা কিছু জিনিসপত্র লয়া আহি, কিন্তু আপনেগোতো দেখি কিছুই দরকার নাইকা!

আমরা পুনরায় এইসকল কথা শুনি এবং বলি, হালার বলদ; কারণ, আমরা জানতে পারি যে, এত কথার পরও আব্দুল আজিজ ব্যাপারি আব্দুল করিমের সঙ্গে ডালের ব্যবসা করতে রাজি হয় না। এভাবে কত দিন কাটে তার হিসাব আমরা ভুলে যাই, কিন্তু আব্দুল করিমের ময়মনসিং এবং ফুলবাড়িয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত হয় না। তখন কোন এক শুক্রবারে আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তৃতীয়বারের মত ঠোঙ্গায় করে ডালপুরি নিয়ে ফেরার সময় সন্ধ্যার মুখে আব্দুল করিমের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং পুনরায় সে তাকে ডালপুরি খেয়ে যাওয়ার জন্য ডাকে।

আঃআঃব্যাপারি : আহো।

আঃকঃ : আলুপুরি?

আঃআঃব্যাপারি : আহো, খায়া যাও।

তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তার ময়মনসিং যাওয়ার প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করে, তুমার মৈমনসিং যাওয়ার কি হইল? আমরা মহল্লায় যখন এই কথা শুনি আমাদের সন্দেহ থাকে না যে, আব্দুল করিম আমাদের সঙ্গে মশকারিই করে এবং আমরা তার পাতা এই ইয়ার্কির ফাঁদে ক্রমাগত ফেঁসে যেতে থাকি; আমাদের মধ্যেও হয়তো ইতিমধ্যে এই খেলার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল এবং এ রকম মনে হয়েছিল যে, আমাদের উচিত তাকে এখন পালাতে না দিয়ে চেপে ধরা এবং আমাদের সঙ্গে এইসব বাজে রসিকতা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমাদের জন্য আরও বিস্ময় বাকি ছিল, তৃতীয় দিন আব্দুল করিমের হাতে হলুদ রঙের গরম এবং তেল জবজবে ডাল অথবা আলুপুরি তুলে দেয়ার পর আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তাকে যে প্রশ্নটি করে আমরা বুঝে পাই না এই প্রশ্ন তাকে কেন আগে করা হয় নাই, অথবা আমরাও কেন একবারও এই কথাটা ভাবি নাই! তৃতীয়বারের মত ডালপুরি খাওয়ানোর পর আব্দুল আজিজ ব্যাপারির মাথায় প্রশ্নটি আসে কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর শুনে সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে; কারণ, সে যখন বলে, তুমার বন্দুর নাম কি? আব্দুল করিম জানায় যে, তার বন্ধুর নাম, শেফালি।

আঃকঃ : আমি মৈমনসিং এইবার যামু। আপনে চাইলে আপনের লাইগা ডাইল আইনা দিবার পারি।

আঃআঃব্যাপারি : শেপালি কে? শেপালি তুমার বন্দু হইল কেমনে?

আঃকঃ : ক্যালা, হয়া পারে না?

আঃআঃব্যাপারি : অরে পাইলা কই?

আঃকঃ : পাইলাম।

আঃআঃব্যাপারি : কই পাইলা, মহাখালি বাসস্ট্যান্ডে?

আঃকঃ : হঁ।

আঃআঃব্যাপারি : তুমারে কইলো বেড়াইতে যাওনের লাইগা!

আঃকঃ : হঁ।

আঃআঃব্যাপারি : তুমার বাপে তুমার উপরে এ্যার লাইগাই চেতে!

আঃকঃ : ক্যালা?

আঃআঃব্যাপারি : চেনা নাই জানা নাই একটা মাইয়া কইলো বেড়াইতে যাইয়েন, আর তুমি ফাল পাড়তাছ!

আঃকঃ : ক্যালা?

আঃআঃব্যাপারি : তুমি মিঞা আদতেই একটা ভোন্দা, তুমার বাপেরে এইসব কথা কইও না, কইলে তুমারে দৌড়াইবনে!

আমাদেরও মনে হয় যে, আসলেই আব্দুল করিম একটা গাধা! কিন্তু তারপর আমরা আব্দুল আজিজ ব্যাপারির মত পুনরায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, কারণ, আব্দুল করিম এসব কথা এবং তিরস্কার মেনে নিতে রাজি হয় না। আব্দুল আজিজ ব্যাপারির ডাল অথবা আলুপুরি খাওয়ার জন্য সে তার বকাঝকা করতে পারার অধিকার মেনে নেয় না।

আঃকঃ : আমি এই মাসেই যামু, আপনেরা যাই কন।

আঃআঃব্যাপারি : তুমি ক্যালা যাইবা, ওই মাইয়ারে দেখনের লাইগা?

আঃকঃ : হ্যঁ, ক্যালা?

আঃআঃব্যাপারি : তুমি ঢাকার বাইরে গেছ কুনোদিন?

আঃকঃ : হের লাইগা যায়া পারুম না?- অসুবিধা নাইকা, যায়া পারুম, ঠিকানা লেইখা লইছি।

ভূতের গলির লোকদের কাছে তখন আব্দুল করিম এবং তার ময়মনসিং যাওয়ার প্রসঙ্গের চাইতে শেফালি প্রসঙ্গ বড় হয়ে ওঠে, দক্ষিণ মৈশুন্দি এবং ভূতের গলির এই মহল্লার লোকদের দিন উত্তেজনায় ভরে যায়, হালায় প্রেম করে নিহি, তারা বলে। তাদের মনে হয় যে, আব্দুল করিম বেকার বলেই তার পক্ষে এইসব করা সম্ভব; তখন মহল্লার লোকেরা বেকার থেকে প্রেম করাকে ঘৃণা করতে শেখে; তারা ভুলতে পারে না যে, শেফালি একটা মেয়ে এবং আব্দুল করিম বলে যে সে তার বন্ধু! ফলে মহল্লার লোকদের রাতের ঘুম বিঘ্নিত হয়, সারা দিনের কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে তারা বিছানায় জেগে থাকে, জীবনের ব্যর্থতা এবং অপচয় বোধ তাদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় এবং তারা কেমন বিষণ্ন হয়ে পড়ে; তাদের মনে হয় যে, বেকার থাকাইতো ভাল আব্দুল করিমের মত! আব্দুল করিম তার অলস সময় শুয়ে বসে কাটায় এবং দূরবর্তী শেফালির গল্প করে, তার ময়মনসিং যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। আব্দুল আজিজ ব্যাপারি অথবা আলি আকবর অথবা বাবুল মিঞার সঙ্গে তার আবার দেখা হয়, তারা যখন বলে, তুমার যাওয়া হইল না? তখন সে তার এই ব্যর্থতার দায় তাদের ওপর চাপায়, বলে, যামু, কইলাম আপনেগো লাইগা কিছু লয়া আহি, আপনেরাতো রাজি হইলেন না! মহল্লার লোকেরা যখন এই কথা শোনে তারা খুব চমৎকৃত হয়, তারা বলে, খোরশেদ আলমের এই পোলাটা হালায় দেখছনি কেমুন সেয়ানা হয়া উঠছে! তখন একদিন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি ডালপুরি কিনে বাড়ি ফেরে, পথে সে আব্দুল করিমকে খোঁজে তাকে চতুর্থ দিনের মত ডালপুরি খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু তাকে দেখা যায় না । মহল্লার লোকেরা যখন এই কথা শোনে এবার তারা আব্দুল আজিজ ব্যাপারিকে গাধা বলে গাল দেয়, তারা বলে, এই হালায় ব্যাপারির বাচ্চা খালি ডাইলপুরি খায়, আর এই বেকার বদমাইশ পোলাটারে লয়া নাচে! কিন্তু

পরবর্তী সময়ে মহল্লার লোকেরা তাদের মত বদলায় এবং আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে তাদের শ্রদ্ধা ফিরে আসে। কারণ, তারা আব্দুল আজিজ ব্যাপারির ডালপুরি খাওয়ার গল্প বিস্তারিতভাবে জানতে পারে এবং তাদের মনে হয় যে, আব্দুল করিমের চালাকির দিন এবার শেষ হবে। ভূতের গলির লোকেরা জানতে পারে যে, আব্দুল আজিজ ব্যাপারি ডালপুরি খাওয়ার জন্য আব্দুল করিমকে খোঁজে বটে তবে তাদের বাসায় গিয়ে ডেকে বের করে আনে না, তার বদলে সে প্রতীক্ষা করে; মনে হয় যেন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি ছিপ ফেলে বসে থাকে, তবে তার প্রতীক্ষার কাল দীর্ঘ হয় না। তিন দিন পর কোন এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, অথবা বুধবারও হতে পারে, সে আব্দুল করিমের দেখা পায় এবং উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কি মিঞা তুমারে দেখি না ক্যালা? তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বোধহয় মনে হয় যে, আসল কথায় সরাসরি না গিয়ে একটু সময় নেয়া যাক; ফলে সে আব্দুল করিমকে একটু খেলানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলে, তুমি তাইলে মৈমনসিং গেলা না? তবে সেদিন বৃহস্পতিবার কিংবা বুধবার সন্ধ্যায় ডালপুরির ঠোঙ্গা নিয়ে বসা আব্দুল আজিজ ব্যাপারি এবং আব্দুল করিমের মধ্যেকার খেলাটা হয়তো একতরফা ছিল না, পারস্পরিক ছিল। মহল্লার লোকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে যে, আব্দুল করিমও খেলোয়াড় খারাপ না; কারণ, সেদিন আব্দুল আজিজ ব্যাপারির কথা শুনে সন্ধ্যার নরম অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে হাসে এবং বলে, আপনে যাইবার কন? তার এই কথা শুনে আব্দুল আজিজ ব্যাপারি হকচকিয়ে যায়, কিন্তু বুদ্ধি হারায় না, সে দ্রুত চাল বদলায় এবং এতে আব্দুল করিম ফেঁসে যায়; আব্দুল আজিজ ব্যাপারির জেরার মুখে আব্দুল করিমকে তার ময়মনসিং ভ্রমণ এবং শেফালির বৃত্তান্ত ভেঙে বলতে হয়। আব্দুল করিম বলে যে, কোন একদিন দুপুরে তার কোন এক বন্ধুর সঙ্গে মহাখালি বাস স্ট্যান্ডে বেড়াতে গেলে সেখানে তারা এই অল্প বয়স্ক গ্রামের মেয়েটিকে পায়, মেয়েটি একা এবং সম্ভবত অসুস্থ ছিল। তাদের সামনে গাড়িতে বসে মেয়েটি বাস ছাড়ার আগেই জানালা দিয়ে মুখ বের করে বমি করে, তারপর হয়তো কুলি করার জন্য অথবা পানি খাওয়ার জন্য সে যখন বাস থেকে নেমে আসে তার পা টলমল করে এবং আব্দুল করিম তা দেখে। তখন আব্দুল করিম তাকে তার বাহু ধরে নিয়ে এসে একটা কাঠের বেঞ্চে বসায়, হোটেল থেকে পানি এনে খাওয়ায় এবং তখন সে জানতে পারে যে, মেয়েটার নাম, শেফালি; এবং তখন শেফালির সঙ্গে তার সব অলৌকিক কথাবার্তা হয়। আব্দুল আজিজ ব্যাপারির প্রশ্নের মুখে সে বলে যে, সে যখন দেখে বা বুঝতে পারে মেয়েটা একা বাড়ি ফিরছে এবং সে অসুস্থ তার বড় মায়া হয় এবং সে বলে, তুমি একলা যায়া পারবা? আব্দুল করিমের কথা শুনে হয়তো মেয়েটার মজা লাগে, সে বলে, কি কইন, পারতাম না ক্যারে, এল্‌কা

কত্তো গেলাম! তখন, তারপর, বাস না ছাড়া পর্যন্ত তাদের দুজনের মধ্যে আলাপ হয় এবং তখন আব্দুল করিম জানতে পারে যে, ময়মনসিং ছাড়িয়ে আকুয়া যেতে হয়, তারপর আকুয়া থেকে ফুলবাড়িয়া; সেখানে কত চাল, কত ডাল, কত আখ এবং গুড় হয়, সেখানে কত আলু সিম এবং বেগুন জন্মে, এবং এ সব জিনিস কত সস্তা দামে ফুলবাড়িয়া হাটে বিক্রি হয়। তখন কোন এক সময় মেয়েটা হয়তো তাকে বলে, আমরার বাইত বেড়াইবার যাইন যে; এবং আব্দুল করিম একটা কাগজে মেয়েটার ঠিকানা লিখে নেয় এবং বলে, মৈমনসিং যাইনিকা কুনো দিন, যুদি যাইবার কও যামুনে একদিন, দেইখা আমুনে তুমারে! সেদিন এটুকু শোনার পর আব্দুল আজিজ ব্যাপারির কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার মনে হয় যে, এটা আব্দুল করিমের একটা খেলাই, এবং সে হয়তো নিজের সঙ্গেই খেলে, শেফালি এবং ময়মনসিং বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে সে হয়তো তার জীবনের কর্মহীনতার ভেতর এই এক অবলম্বন গড়ে তোলে। তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তার নিষ্ঠুর সিদ্ধান্তটি নেয়, তার বোধহয় মনে হয় যে, চালাকি করার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তো তার চাপ মারার এইসব প্রবণতা দূর হবে; ফলে সে বলে, তুমি যাও, আমার লাইগা পাঁচ কেজি ডাইল লয়া আইয়ো, যুদি দেখি যে পড়তা ভালা পড়তাছে পরে বিশি কইরা আনামুনে। কিন্তু মহল্লার লোকেরা বলে যে, আব্দুল আজিজ ব্যাপারির মত তারাও আব্দুল করিমকে বুঝতে পারে নাই, কারণ, আব্দুল আজিজ ব্যাপারির কথা শুনে সে বলে যে, সে ডাল কিংবা আলু কিংবা গুড় এনে ব্যাবসা করার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে, সে এখন এমনি বেড়াতে যাবে। তার এই কথা শুনে আব্দুল আজিজ ব্যাপারির হয়তো ভাল লাগে না, পরাজিত এবং অপমানিত লাগে, এবং তার আর কিছু বলার থাকে না; সে একটা ডালপুরি আব্দুল করিমের হাতে তুলে দিয়ে বলে, ঠিক আছে, লও খাও, এবং আব্দুল করিম শেষ পুরিটাও মজা করে খায়।

ভূতের গলির লোকদের কাছে তখন ব্যাপারটা রহস্যজনক হয়ে দাঁড়ায়, তাদের মনে হয় যে, আব্দুল করিম হয়তো মহল্লার মানুষদের এবং নিজেকেও বোকা বানায় মাত্র; তাদের সন্দেহ যায় না, ফলে আব্দুল আজিজ ব্যাপারি পুনরায় ডালপুরি অথবা আলুপুরি কিনে আব্দুল করিমকে খোঁজে, তারপর তাকে যখন পুনরায় একদিন রাস্তায় পায় তাকে সে তার বাড়িতে নিয়ে যায়, বলে, আহো তুমিতো ডাইল আইনা দিবা না, আহো আলুপুরি খায়া যাও! সেদিন আব্দুল আজিজ ব্যাপারি তাকে বলে, তুমি তাইলে মৈমনসিং এমনেই বেড়াইবার লাইগা যাইতাছ? মহল্লার লোকেরা বলে যে, অবশেষে আব্দুল আজিজ ব্যাপারি হয়তো বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল এবং আব্দুল করিম যখন নমুনা হিসাবে পাঁচ কেজি ডাল এনে দিতে পুনরায় অস্বীকার করে তখন সে খেলাটা জারি রাখার চেষ্টা করে ,

যাতে আব্দুল করিম এখন ভেগে যেতে না পারে। তার কথা শুনে আব্দুল করিম যখন ঘাড় নাড়ে এবং বলে, হুঁ এমনেই যামু, তখন সে বলে, তুমি তুমার লগে আমার দুলাল মিঞারে লয়া যাও না ক্যালা, তুমি শেপালিরে দেইখা আইলা, অয় হাট বাজারে কি পাওন যায় দেইখা আইলো। আব্দুল আজিজ ব্যাপারির হয়তো মনে হয়েছিল যে, আব্দুল করিম তার এ প্রস্তাবে রাজি হবে না; কারণ, এত কথার পর তার হয়তো মনে হয়েছিল যে, আব্দুল করিমের ময়মনসিং যাওয়ার এসব কথাবার্তা তারপরেও হয়তো ভুয়া এবং শেফালিও কাল্পনিক। কিন্তু মনে হয় যে, তার ধারণা পুনরায় ভুল ছিল, আব্দুল করিম তার কথায় রাজি হয়ে যায় এবং বলে, তাইলেতো খুবই ভাল হয়, দুইজনে গপসপ মাইরা যাওন যায় - অসুবিধা হইব না, শেপালিগো বাইতে বড় টিনের ঘর আছে, আরামে থাকন যাইবনে; দুইজনে বেড়ায়া বুড়ায়া আমুনে।

ভূতের গলির লোকেরা এই গল্প করেঃ

আমরা তখন সব জানতে পারি, আব্দুল করিম ময়মনসিং রওনা হয়, সঙ্গে যায় আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বড় ছেলে দুলাল মিঞা; ভূতের গলিতে একমাত্র আলি আকবর এবং বাবুল মিঞা ছাড়া আমরা সকলেই এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হই- আব্দুল করিমের পিতা খোরশেদ আলমও অবশ্য খুশি হয় না। যাহোক আমরা খুশি হই, কারণ আমাদের মনে হয় যে, সঙ্গে দুলাল মিঞা থাকায় পরে আমরা সব ঘটনা বিশদ জানতে পারব, আব্দুল করিমের উপায় থাকবে না বানিয়ে মিথ্যা কথা বলে আমাদের ঠকানোর।

এভাবে আব্দুল করিম এবং দুলাল মিঞার যাত্রা শুরু হয়, আব্দুল আজিজ ব্যাপারির বাড়িতে শেষবার ডালপুরি খাওয়ার এক/দুই দিন পর, পরবর্তী মঙ্গলবার, দিনটা ভাল বলে, খুব সকালে তারা দুইজন সত্যি রওনা হয়; আমাদের বিশ্বাস হতে চায় না, কিন্তু তারা কাঁধে এয়ার ব্যাগ ঝুলিয়ে রিক্সা চেপে মহল্লা থেকে বের হয়ে যায়, এবং যখন সত্যি তারা যায়, আমরা তিন/চার দিন পর তাদের প্রত্যাবর্তনের আশা করি, আমরা বলি, হয়তো পাঁচ/সাত দিনও লাগতে পারে,—কিন্তু সেদিন রাতেই তারা মহল্লায় ফিরে আসে। পরে আমরা আব্দুল করিম এবং দুলাল মিঞার কাছ থেকে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনি।

দুলাল মিঞা বলে যে, সেদিন সকালে মহাখালি বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছার পর, তারা প্রথমেই এক সমস্যার মধ্যে পড়ে; কারণ, তারা দেখে যে, ফুলবাড়িয়া যাওয়ার দুই রকমের বাস রয়েছে, তারা চাইলে ময়মনসিংয়ের বাসে করে ময়মনসিং যেতে পারে, সেখান থেকে ফুলবাড়িয়া; অথবা তারা সরাসরি ফুলবাড়িয়ার বাস ধরতে পারে। কিন্তু আমরা, মহল্লার লোকেরা, তাদের সঙ্কটের বিষয়টি বুঝতে পারি না, আমরা বলি, এইটা কুনো কথা, তরা ফুলবাইড়া যাবি,

ফুলবাইড়ার ডাইরেক্ট বাসে যাবি। কিন্তু দুলাল মিঞা বলে, শেফালি আব্দুল করিমকে যে ঠিকানা দেয় তাতে বলা ছিল, ঢাকা মহাখালি থেইকা বাসে চইড়া মৈমনসিং, মৈমনসিং গাঙ্গিণার পাড় থেইকা ফুলবাইড়ার বাসে কইরা ফুলবাইড়া। এ কথা শুনে সমস্যার প্রকৃতিটা আমরা বুঝতে পারি, এবং দুলাল মিঞা বলে যে, আব্দুল করিম শেফালির দেয়া নির্দেশনা অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়, তারা ময়মনসিংয়ের বাসে চেপে বেলা বারটার সময় ময়মনসিং পৌছায়; তারপর গাঙ্গিণার পাড়ে বাস বদল করে যখন ফুলবাইড়ার মুড়ির টিন বাসে চড়ে তাদের খুব খিদে পায় কিন্তু বাস ছেড়ে দেয়ার উপক্রম করায় তারা আপাতত ভাত খাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে ঝাল মুড়ি কিনে খায়। ময়মনসিং থেকে রওনা হওয়ার দুই ঘন্টা পর তারা ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে পৌছায়, দুলাল মিঞা বলে যে, এর পর তাদের আসল সঙ্কট শুরু হয়, কারণ, তারা কিছুই খুঁজে বের করতে পারে না, কেবল একটি মেয়ের নাম ছাড়া মনে হয় আব্দুল করিমের আর কিছুই জানা ছিল না, কিন্তু কেবল একটি মেয়ের নাম কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়? বলা যায়, আপনেরা শেপালিরে চিনেন, অগো বাড়ি কুন দিকে?- বলা যায় না, ফলে, দুলাল মিঞা তার উপর ক্ষেপে .

দুঃমিঞা : তুমার মত এমুন ভোদাইতো হালায় আমি জিন্দেগিতে দেখিনিকা!

আঃকঃ : ক্যালা, এই কতা কচ ক্যালা?

দুঃমিঞা : নাম ছাড়া আর কিচ্ছু জান না, তুমি খুঁইজ্জা বাইর করবা কেমনে এই শেপালিরে?

আঃকঃ : তুই আইলি ক্যালা? তরে আমি আইবার কইছিলাম!

দুঃমিঞা : আমি কি জানি নিহি যে, তুমি এমুন কাম কইরা রাখচো, নাম ছাড়া কিচ্ছু জান না!

কিন্তু দুলাল মিঞা বলে যে, তার কথায় আব্দুল করিম বিচলিত হয় না; সে বলে, দেখ না কেমনে বাইর করি! তারা তখন বাসস্ট্যান্ডের একটা চায়ের দোকানে বসে চা খায়, হয়তো সিঙ্গারা বা নিমকিও, কারণ, আব্দুল করিম তাকে বোঝায় যে, শেফালিদের বাড়ি গিয়েই এখন তারা খেতে পারবে। তখন দুলাল মিঞা এই চায়ের দোকানে বসে শেফালির বাড়ির ঠিকানা লেখা কাগজটা প্রথম দেখে, সে আমাদেরকে বলে, এমুন ঠিকানা হালায় আমি বাপের জন্মে দেখিনিকা; তখন তার কথা শুনে আমাদের মনে হয় যে, এমন অদ্ভুত বিষয় আমরাও কখনো শুনি নাই। কিন্তু দুলাল মিঞা অনেক কথা ঠিকমত বলতে পারে না, তখন আমাদের মনে হয় যে, শেফালির ঠিকানা লেখা আব্দুল করিমের কাগজটা আমাদের দেখা দরকার; ফলে আমরা তখন আব্দুল আজিজ ব্যাপারির স্মরণাপন্ন হই এবং তাকে বলি, আমরা কইলে আমাগো কথা হুনবো না, আপনেতো অরে

ডাইলপুরি খাওয়ান, অরে কন আমাগো কাগজটা দেখাইতে। আব্দুল আজিজ ব্যাপারি আমাদের দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে একমত হন এবং জানান যে, এরকম একটি কাগজ আমাদের অবশ্যই দেখতে পারা দরকার এবং তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। পরে আব্দুল আজিজ ব্যাপারি কাগজটা সংগ্রহ করে এবং আমরা সেটা দেখতে পাই; সে তখন আমাদেরকে বলে, পোলাটা খরাপ না, পরথম কইছিল যে কাগজটা নাইকা, ফালায়া দিছে, কিন্তু আমি যখন কইলাম, আমি তুমার বাপের বন্দু আমার কথা হুনবা না? তখন আয়া কাগজটা দিয়া গেল, কইলো, লন এইটা আপনেরে দিয়া দিলাম! তখন আমরা, ভূতের গলির লোকেরা কাগজটা দেখি।

একটা সাদা কাগজে প্রথমে ঠিকানা লেখা ছিলঃ

মোছাঃ শেপালি বেগম

ফুলবাইড়া

মৈমনসিং

এরপর ছিল পথের নির্দেশঃ

ঢাকা মহাখালি বাস স্ট্যান

মৈমনসিং শহর, গাঙ্গিনার পাড়

গাঙ্গিনার পাড়- আকুয়া হয়া ফুলবাইড়া বাজার, থানার সামনে

উল্টা দিকে হাঁটলে বড় এড়াইচ গাছের (কড়ুই গাছ) সামনে টিএনউ অপিস

টিএনউ অপিস সামনে রাইখা খাড়াইলে, বাম দিকের রাস্তা- নাক বরাবর

হাই স্কুল ছাড়ায়া বরাবর সুজা, ধান ক্ষেত, কাঁটা গাছ, লাল মাটি,

বামে মোচড় খায়া নদী

আহাইলা/আখাইলা/আখালিয়া নদী

নদী পার হয়া ব্রিজ পিছন দিয়া খাড়াইলে

দুপুর বেলা যেদিকে ছেওয়া পড়ে তার উল্টা দিকে,

ছেওয়া না থাকলে, যেদিকে হাঁটলে পায়ের তলায় আরাম লাগে সেই দিকে

নদীর পাড় বরাবর এক মাইল হাঁটলে দুইটা নাইরকল গাছ

দুই নাইরকল গাছের মইদ্দে খাড়ায়া গ্রামের দিকে তাকাইলে

তিনটা টিনের ঘর দেখা যাইব

তিনটা ঘরের একদম বাম দিকের ঘরের পাশ দিয়া যে রাস্তা গেছে

সেই রাস্তা ধইরা

আগাইলে চাইর দিকে ধান ক্ষেত, পায়ে হাঁটা আইলের রাস্তা

দূরে চাইর দিকে আরো গ্রাম

ক্ষেতে পাকা ধান যেদিকে কাইত হয়া আছে, সেই দিকে,

অথবা, যদি ধানের দিন না হয়,
যেদিকে বাতাস বয় সেই দিকে গেলে পাঁচটা বাড়ির ভিটা দেখা যাইব,
তিনটা ভিটা সামনে দুইটা পিছনে,
পিছনের দুইটা বাড়ির ডালিম গাছওয়ালা বাড়ি।

দুলাল মিঞা বলে, এই হালার মাতারি এত কথা কইছে, কিন্তু বাপের নাম, গ্রামের নাম, কিছু দেয় নাইকা; কিন্তু সে বলে যে, তারপরেও ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে চায়ের দোকানে বসে যখন ঠিকানার এই বর্ণনা দেখে সে চমৎকৃত হয় এবং আব্দুল করিম তার দিকে তাকিয়ে বলে, ঠিকানা ঠিক আছে না? দুলাল মিঞা আমাদেরকে বলে, তার তখন মনে হয়, ঠিকানা হয়তো ঠিক আছে, হয়তো দুই নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে তাকালে শেফালি বেগমদের গ্রাম দেখা যাবে, হয়তো ডালিম গাছ তলায় শেফালি বেগম উদয় হবে এবং আব্দুল করিমের মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে, আইছুন, চিন্না আইবার পারলাইন, আহুইন! কিন্তু ধান গাছের শুয়ে থাকা এবং সূর্যের ছায়া দেখে পথ ঠিক করার প্রসঙ্গে সে বিভ্রান্ত বোধ করে, তার মনে হয় যে, এমন ঠিকানার কথা সে জীবনে শোনে নাই, তবে, তবু সে বুঝতে পারে যে, কিছুই না থাকার চাইতে হয়তো এ অনেক ভাল; এবং সে আব্দুল করিমের কথা শুনে বলে, হঁ ঠিক আছে, অখনে খুঁইজ্জা পাইলে হয়!

তখন ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে তারা আর একবার শুরু করে, পাকা রাস্তা ধরে আলিয়া মাদ্রাসা পার হয়ে, কলেজের সামনে তারা ঝাঁকড়া প্রাচীন কড়ুই গাছের তলায় এসে হাজির হয়, এই গাছের সামনেই টিএনও-র অফিস বিল্ডিং; তারা পুরনো দিনের অভিযাত্রীদের মত কাগজে লেখা পথনির্দেশ অনুসরণ করে এগোয়; টিএনও-র অফিসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তারা দেখে যে, একটি হেরিংবোন ইটের রাস্তা এই অফিসের সীমানা দেয়াল ঘেঁষে বাঁ দিক দিয়ে চলে গেছে, দুই ধারে পাকা ধানের জমি, এই পথ ধরে এগিয়ে তারা এক চৌমাথায় পৌঁছায়, তখন ডান দিকে রোদের ভেতর কাত হয়ে থাকা সোনালি রঙের আমন ধানের বিস্তীর্ণ মাঠের পারে তারা একটা সাদা রঙের দালান দেখতে পায়, তাদের মনে হয় যে, এটা হয়তো হাইস্কুল হবে, কিন্তু এতদূর থেকে বুঝতে না পেরে তাদের মনে হয় যে, তারা কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে, ভাই অইটা কি ইস্কুল? কিন্তু কোন লোক না পেয়ে তারা কাগজটা আবার পড়ে, হাইস্কুল ছাড়ায়া সুজা, এবং তারা বুঝতে পারে যে, তারা যে পথে এসেছে সে বরাবর সোজা হবে; তখন তারা চৌরাস্তা পার হয়ে মেঠো পথে পড়ে, এই রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগোনোর পর তারা দেখে যে, মাটির রঙ এখানে লাল হয়ে উঠেছে. রাস্তার দুই পাশ ফনিমনসার ঝোপে পূর্ণ হয়ে আছে এবং তারা বুঝতে পারে যে, তারা ঠিক পথেই আছে এবং সহসাই তারা এই পথের মোচড় পার হয়ে আখালিয়া নদীর পাড়ে গিয়ে হাজির

হয়। আমরা দুলাল মিঞার কাছ থেকে জানতে পারি, তারা তাদের সামনে সংকীর্ণ কিন্তু খাড়া এবং গভীর একটি নদী খাত দেখতে পায়, নদীর তলদেশ তখন ছিল প্রায় শুকনো, পানির একটি ক্ষীণধারা অতিকষ্টে টিকে ছিল। দুলাল মিঞা বলে যে, নদী পেয়ে যাওয়ায় তার উৎসাহ বাড়ে, কারণ, সে বলে যে, নদী হচ্ছে এমন এক বস্তু যা দেখলে সব সময় মনে হয়, কোথাও এসে পৌঁছলাম! আমরা জানতে পারি যে, গজারি গাছের খুঁটি এবং তক্তা দিয়ে তৈরি একটা চওড়া সাঁকো সমর্থ সম্ভোগরত প্রেমিকের পিঠেরমত ঈষৎ বাঁকা হয়ে নদীর দুই পাড়ের লাল মাটি স্পর্শ করে পড়ে ছিল; সেই দুপুরে অথবা দুপুরের পর দুলাল মিঞার পিছনে আব্দুল করিম আখালিয়া নদীর সাঁকোর ওপর উঠে আসে। দুলাল মিঞা বলে যে, নদীর অন্য প্রান্তে পৌঁছে তারা যখন পুনরায় পাড়ের ওপর অথবা সাঁকোর কিনারায় দাঁড়ায় তারা দেখে যে, তাদের ছায়া দেহের মায়া ত্যাগ করে দূরে যেতে চায় না, পায়ের নিচে পোষা কুকুরের মত শুয়ে থাকে। দুলাল মিঞা বলে, ছায়া দেখে যখন এগোনোর উপায় থাকে না, তারা দ্বিতীয় নিয়মটি অনুসরণ করতে চায়; তখন আব্দুল করিমের এই রকম মনে হয় যে, কোন দিকে হাঁটলে আরাম লাগবে সেটা বুঝতে হলে পায়ের জুতা খুলে ফেলা দরকার; সে দুলাল মিঞাকে বলে, খাড়া আমি খুলতাছি, তর খুলোন লাগব না। দুলাল মিঞা আমাদেরকে বলে যে, এই জুতা খুলতে গিয়েই সমস্যা দেখা দেয়, আব্দুল করিম সাঁকোর কাঠের রেলিঙের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটু কুঁজো হয়ে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে পা উঁচু করে জুতার ফিতা খোলার চেষ্টা করে, এবং ভুল প্রান্ত ধরে টেনে ফিতায় গিঁট লাগিয়ে ফেলে; তারপর টানাটানি করার ফলে গেরোটা বিষ গেরো হয়ে দাঁড়ায়। সে এবার হাঁটু গেড়ে এক পায়ের উপর বসে কিছুক্ষণ ফিতা ধরে টানাটানি করে, নখ দিয়ে খুঁটে খোলার চেষ্টা করে, এবং অনেক পরিশ্রমের পর সে যখন ফিতার জট শেষ পর্যন্ত খুলতে পারে তখনই সমস্যাটা দেখা দেয়। সে ঘাড় তুলে দুলাল মিঞার দিকে তাকায়; দুলাল মিঞা আমাদেরকে বলে, আমি ভাবলাম যে বোধহয় ঘাড় সুজা করবার লাগাইছে। কিন্তু আমরা দুলাল মিঞার কাছ থেকে জানতে পারি যে, ব্যাপারটা আসলে তা ছিল না, আব্দুল করিম উপরের দিকে তাকিয়ে যা বলে তাতে দুলাল মিঞা প্রথমে বিভ্রান্ত বোধ করে তারপর তার মেজাজ খারাপ হয়, কারণ, আখালিয়া নদীর সাঁকোর কাঠের পাটাতনের উপর এক পায়ের উপর বসে থেকে দুলাল মিঞার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, ল দুলাইলা, যাইগা।

দুঃমিঞা : কি কও!

আঃকঃ : ল ফিরা যাই।

দুঃমিঞা : ক্যালা?

আঃকঃ : এমনেই, ল যাইগা।

দুঃমিঞা : অহনে এই কথা কও, আইলা ক্যালা!
আঃকঃ : আইলাম, ল অখন যাইগা।
দুঃমিঞা : আমারে আনলা ক্যালা?
আঃকঃ : তুই আইলি ক্যালা!

আমরা দুলাল মিঞার কাছ থেকে শুনি যে, এরপর আব্দুল করিম তার জুতার ফিতা পুনরায় বেঁধে উঠে দাঁড়ায় এবং দুলাল মিঞার সকল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ফিরতি পথ ধরে, বস্তুত তারা হয়তো কখনোই আখালিয়া নদী অতিক্রম করে নাই; এবং দুলাল মিঞাকে বাধ্য হয়ে তার পিছনে আসতে হয়। তখন দুলাল মিঞা ফিরে যাওয়ার আগে বাজারে গিয়ে জিনিসপত্রের দরদাম যাচাই করে দেখার কথা বলে, কিন্তু আব্দুল করিম কিছু শোনে না, নদীর সাঁকোর উপরে তার কি হয়, সে বলে যে, প্রথমে তারা বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে ফিরতি বাসের খোঁজ করবে, কারণ, তাদের ঢাকা যাওয়ার শেষ বাস ধরতে হবে, তারপর সময় পেলে তারা বাজার ঘুরে দেখতে পারে। কিন্তু সেদিন তাদের ফুলবাড়িয়া বাজার ঘুরে দেখা আর হয় না, হয়তো সব ডাল, সব চাল, আলু এবং গুড় নিয়ে দোকান অথবা হাটের লোকেরা প্রতীক্ষায় থাকে, কিন্তু আব্দুল করিম এবং দুলাল মিঞার সময় হয় না। তারা যখন টিএনও অফিসের সামনে পৌঁছায় তারা একটু দূরে কলেজের সামনে একটা বাস দেখতে পায়, বাসের হেলপার চিৎকার করে, ওই ঢাকা ঢাকা, লাস্ট বাস লাস্ট বাস, ছাইড়া গেল ছাইড়া গেল; দুলাল মিঞা বলে যে, তখন তাদের দৌড়ে গিয়ে এই বাস ধরা ছাড়া কিছু করার থাকে না।

ভূতের গলির লোকেরা পরে বলে যে, তাদের জানা ছিল আব্দুল করিম এরকমই কিছু একটা করবে, তারপর তারা আব্দুল করিমের কথা পুনরায় ভুলে যায়; কিন্তু মহল্লায় আব্দুল আজিজ ব্যাপারি ডালপুরি খাওয়ার অভ্যাস বাদ দিতে পারে না, সে কখন কখন ডাল অথবা আলুপুরি কিনে আনে, এবং যখন আব্দুল করিমকে দেখে তাকে কখনো পুরি খেয়ে যাওয়ার কথা বলে, আহো ডাইলপুরি খায়া যাও, তখন আব্দুল করিম তার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ডাল অথবা আলুপুরি খায়, এবং বলে, হালারা আলু দিয়া ডাইলপুরি বানায়!

১৯৯৯

# আমাদের বকুল

গ্রামের লোকেরা তার প্রত্যাবর্তণের প্রতীক্ষায় ছিল।

সন্ধ্যার আগ দিয়ে আকালু সুহাসিনীতে ফেরে, সেই সময় গ্রামের যারা হেমন্তের বিস্তীর্ণ মাঠে নুয়ে থাকা ফসলের ওপর দিয়ে তাকায়, তারা তাকে কহুদূরে বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পার হয়ে খোলা মাঠের কুয়াশার ভেতর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে। গ্রামের এইসব মানুষ তখন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, আকালু অস্পষ্ট সোনালি রঙের ঈষৎ ঢেউ খেলানো ধান ক্ষেতের দূর প্রান্তে যখন উদয় হয় তাকে একটি বিচ্ছিন্ন বিষণ্ন ধলা বকের মত দেখায়; এবং গ্রামের লোকদের মনে হয় যে, ফাতেমার জন্য সত্যি কি আকালুর হৃদয় কাঁদে! বিশ্বাসপাড়ার কাছে এসে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ছেড়ে সে ধান ক্ষেতে নেমে আলপথ ধরে; তখন সন্ধ্যার ম্লান আলোর ভেতর তার লম্বা শরীর মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে।

সে তার শ্বশুরবাড়িতে তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রী, ফাতেমাকে খুঁজতে গিয়েছিল।

আকালু যখন গ্রামের কাছে এসে পড়ে গ্রামের লোকেরা তার মুখের দিকে তাকায়; তাদের মনে হয় যে, তার মুখে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারের ভেতরেও বিষণ্নতার গভীর ছায়া লেগে আছে। সে কোনাইবাড়ির কাছে এসে ধান ক্ষেতের ভেতর থেকে বের হয়ে গ্রামের লোকদের সামনে দিয়ে হেঁটে মিঞা বাড়ির পিছনে তার ভিটার দিকে যায়। সুহাসিনীর লোকদের তখন খুব ইচ্ছা হয় তাকে ডাক দিয়ে থামায়, বলে, শোনেক বাপু, খাড়া, কি হইলো ক, শুনি। কিন্তু তখন তারা অত কিছু বলতে পারে না , তাদের কেউ কেউ তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকায় এবং বলে, ক্যারে আকালু, ফিরলি বাপু, তারপর তাদের কথা ফুরিয়ে যায়; আকালু ঘাড় সামান্য কাত করে গ্রামের লোকদের মুখের দিকে তাকায় তারপর কোন কথা না বলে, মিঞা বাড়ির প্রাঙ্গণ ঘেঁষে মাথাভাঙা আম গাছ তলা দিয়ে নিজের ভিটায় জীর্ণ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে ওঠে।

যেদিন ফাতেমা নিখোঁজ হয়, সেদিন সকালে অথবা দুপুরে অথবা বিকালে বাড়ির সকলে যখন বুঝতে পারে যে, ফাতেমাকে অনেকক্ষণ হলো দেখা যাচ্ছে না, তারা, বাড়ির লোকেরা, আকালু বকুল এবং আমির হোসেন তাকে চারদিকে খোঁজে।

আকালু বলে, দেখতো রান্দে নাকি ।

তারা রান্না ঘরে যায়, দেখে যে, রান্না ঘর খা খা খালি পড়ে আছে; তাদের মনে হয় যে, সেদিন রান্নাই হয় নাই এবং তারা সারাদিন কিছু খায় নাই; তাদের তখন তেষ্টা পায়, তারা মাটির কলসি থেকে পানি ঢেলে খাওয়ার চেষ্টা করে এবং দেখে যে, কলসিও খালি, তখন আকালু কুয়াতলায় গিয়ে কলসিতে পানি ভরে আনে।

আকালু বলে, দেখতো গোয়াইল ঘরে কিছু করে নাকি ।

তখন তারা গোয়াল ঘরে যায়, দেখে যে, গরুর চাড়িতে জাবনা নাই, তাদের একটা মাত্র গাই, সেটা বেড়ার পাশে বসে ঝিমায়; তারা ফাতেমাকে পায় না, তাদের বিষণ্নতা হয়, হয়তো তারা ভয় পায়, বকুল এবং আমির হোসেন, মা মা, বলে কাঁদে। আকালু বুঝতে পারে না ফাতেমা কোথায় গেল, কেন গেল, এবং সে কি করবে।

তখন আকালু বলে, দেখ হয়তো বাড়ির পিছনে পাতা কুড়াইব্যার গেছে, কিম্বা হয়তো পালানে কিছু করে।

গোয়াল ঘর থেকে বের হয়ে তারা বাড়ির পিছনে বাঁশ ঝাড়ের কাছে যায়, যদি সেখানে ফাতেমা থাকে, হয়তো সেখানে সে ঝরে পড়া শুকনা পাতা ঝাঁট দিয়ে জড়ো করে। বাঁশ বনের কাছে গিয়ে তারা দেখে যে, বাঁশ গাছের নিচে ঝরা পাতায় ছেয়ে আছে, হেমন্তের হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাসে এই পাতা এলোমেলোভাবে ওড়ে, কিন্তু ফাতেমা নাই। তারা তখন বাড়ির উত্তর পাশের পালানে যায়, হয়তো ফাতেমা কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে ডাটার বিচি লাগায়, অথবা হয়তো বরইয়ের কাঁটা পুঁতে বেড়া দেয়, হয়তো এই কাজ করতে গিয়ে তার বাড়ির কথা মনে থাকে না; কিন্তু ফাতেমাকে পালানে পাওয়া যায় না।

তখন আকালু বকুলকে রৌহার বিলে পাঠায়, বলে, যাতো বকুল, যায়া দেখতো বিলে গেছে নাকি শাক তোলার নেইগা।

বকুল দৌড়ে বাড়ির পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়, মহির সরকারের বাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে সে জঙ্গলে ভরা শুকনা রৌহার দিকে তাকায়, বিলে কোন মানুষ নাই, ফাতেমাও না; তখন বকুল এবং আমির হোসেনকে বাড়িতে রেখে আকালু গ্রামের

ভেতর ফাতেমাকে খোঁজে; হয়তো সে কারো ঢেঁকি ঘরে কাজ করে, হয়তো তার প্রবল নিতম্ব দুলিয়ে মিঞা বাড়িতে ধান ভানে অথবা চিড়া কোটে। কিন্তু সুহাসিনীর কোন ঢেঁকি ঘরে ফাতেমাকে পাওয়া যায় না।

যেদিন আকালু তার শ্বশুর বাড়ি থেকে খালি হাতে ফিরে আসে তার পরদিন গ্রামের লোকেরা লক্ষ্মীকোলার মাঠে মহির সরকারের ধান ক্ষেতে তাকে কামলা দিতে দেখে। সেসময় যারা লক্ষ্মীকোলার মাঠে ধান কাটার কাজ করে তারা তাদের কাজের ফাঁকে নাড়ার আগুনে হুকোয় তামাক সেজে টানে। তারা হুঁকোর ফুটোয় লেগে যাওয়া থুতু হাতের চেটোয় মুছে আকালুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কোনো খবর পাইলি তর বৌয়ের?

সে হুঁকোর ফুটোয় মুখ লাগিয়ে দম ধরে থাকে, কিছুক্ষণ পর ছোট ছোট কয়েকটা টান দিয়ে বলে, মাগি, তারপর প্রবল শব্দ করে পুনরায় হুঁকো টানে। তখন লক্ষ্মীকোলার মাঠের মধ্যে রোদের ভেতর বসে সুহাসিনীর ক্ষুদে কৃষক এবং দিনমজুর কামলারা আকালুর কথার অর্থ বুঝতে পারে না; তারা আকালুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, পাইছিস ? এবং তাদের মনে হয় যে, আকালু এবার তাদের কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে পারবে না। কিন্তু আকালু তাদের প্রশ্ন শুনে পুনরায় চুপ করে থাকে, তারপর চোখ কুঁচকে খকখক করে থুতু ফেলে বলে, এই মাগির নেইগা তিনট্যা দিন নষ্ট কইরল্যাম, কাম কইরলে একশ/দেড়শ ট্যাহার কাম করা যাইতো!

গ্রামের লোকের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার হয় না, তারা কাজে উঠে যেতে যেতে বলে, ট্যাহার হিসাব পরে করিস, শালার ব্যাটা চামার, তর বউয়েক পাইছিস নাহি ক ।

> পাইলে কি রাইখ্যা আসি, শালির বিটির চুলের মুঠ ধইর‍্যা নিয়্যা আইসত্যাম না!
>
> তিন দিন ধইর‍্যা তর বৌয়ের খোঁজ নাই, তুই হারামযাদা চুপচাপ বইস্যা বইস্যা তামাক খাইস, আর এই রকম কইরা কথা কইস!
>
> তামুক খামু না তো কি করমু, বৌ কি গরু নাহি যে রাস্তা ঘাটে খুঁইজব্যার যামু, জনে জনে যায়া জিগাস করমু, বাপু আমার বৌয়েক দেইখছেন নাহি!
>
> তার নেইগা তুই এই রকম কইর‍্যা বইসা থাকপি!
>
> কি করমু আমি, আমি কোনে যামু খুঁইজব্যার!

তখন আকালু কাঁদে, হেমন্তের নরম রোদের স্পর্শ এবং পাকা ধান গাছের সোঁদা গন্ধের ভেতর বসে সুহাসিনী গ্রামের ভূমিহীন দিনমজুর আকালু শেখ চোখের পানি ফেলে। তার এই হঠাৎ ভেঙে পড়ার ঘটনায় লক্ষ্মীকোলার মাঠের

ভেতর বসে সুহাসিনীর কৃষকেরা হয়তো সত্যি বিচলিত হয়, হয়তো হয় না, কারণ, তারা আকালুকে বলে, মাইর‍্যা ফালাইস নাইতো!

আকালু তাদের এই কথা হয়তো শোনে, হয়তো শোনে না, সে চুপ করে থেকে গামছার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে কাঁচি হাতে উঠে যায়। সুহাসিনীর কৃষকেরা সূর্য মাথার ওপর উঠে আসা পর্যন্ত একটানা কাজ করে। দুপুরে তাদের বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসে, তারা ক্ষেতের আলের ওপর বসে খায়; আকালুর খাবার আসে না, সে নাড়ার আগুনে পুনরায় তামাক ধরিয়ে টানে।

> ক্যারে আকালু, দুপুরে খালি তামাক খায়া থাকপি?
>
> তোমাগোরে এত কথা দিয়া কাম কি, আমি তামুক খায়া থাকি, গু খায়া থাকি, তোমাগোরে কি!
>
> তর বাড়িত কি রান্দাবাড়া করা বন্দ? তর ছাওয়াল পাওয়াল কি খায়? বকুল রাইনব্যার পারে?
>
> পান্তা আছে খাইবনি, আমি সইন্দায় যায়া রানমু।

তখন আকালু মাঠের কৃষকদের দেয়া খাবারের ভাগ খায়। তারপর তারা পুনরায় সারি বেঁধে ফসলের মাঠের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, নুয়ে কাত হয়ে থাকা ধান গাছের গোড়া কেটে মাটির ওপর শুইয়ে দিতে দিতে এগোয়। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর দিনের আলো যখন নরম হয়ে আসে এই কৃষকেরা ধান কাটার কাজ বন্ধ করে, সারা দিনে কাটা ধান আঁটি বেঁধে মহির সরকারের প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে ওঠায়। তখন মহির সরকারের কাচারি ঘরের বারান্দায় বসে তারা দিনের শেষ হুঁকা সাজায়। আকালু মুখ কালো করে টিনের বেড়ার সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে বসে থাকে।

> ক্যারে আকালু, তামুক খাবি না! তামুক খায়া বাড়িত যা, বৌ না থাইকলে কেমন নাগে বোঝ গা!

আকালু হুঁকো নিয়ে চুপচাপ টানে, তারপর বলে, তোমরাতো কও আমি বৌ মাইর‍্যা ফালাইছি!

অন্য এক হেমন্তে আকালু যেদিন বিয়ে করে তেবাড়িয়া থেকে ফেরে সেদিন সুহাসিনীতে এক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সুহাসিনীর কৃষকেরা যারা বিশ্বাসপাড়ার মাঠে পাকা ধান কাটায় ব্যস্ত ছিল তারা দিগন্তের প্রান্তে বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের কাছে আকালু এবং তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে দেখে। সেদিন গ্রামের লোকেরা দেখে যে, মলিন পাঞ্জাবি এবং লুঙ্গি পরা আকালু, রাস্তার ধুলো উড়িয়ে তার পিছনে দড়ি বাঁধা একটি ধূসর রঙের গরুর বাছুর টেনে নিয়ে আসে। আকালু এবং তার গরুর একটু পিছনে হেঁটে আসে ঘোমটা টানা নুয়ে পড়া একটি মেয়ে।

পরদিন আকালু গ্রামের লোকদের সঙ্গে কামলা খাটতে যায়, বিশ্বাসপাড়া, লক্ষ্মীকোলা অথবা চকনূরের মাঠে। তখন সুহাসিনী অথবা ব্যাঙনাই অথবা বাঁশরিয়া গ্রামের কৃষকেরা তাকে বলে, ক্যারে আকালু একলা একলা বিয়া কইর‍্যা ফালালি!

তাদের কথা আকালু হয়তো শোনে না, কারণ সে চুপ করে হুঁকো টানে। কিন্তু গ্রামের কৃষক এবং ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা তাকে ছাড়ে না, তারা তার পিছনে লেগে থাকে।

- ক্যারে, নিজে নিজে বিয়া কইরলি, আমাগোরে দাওয়াত দিলি ন্যা!
- দাওয়াতের কাম নাই!
- ক্যা, আমরা দাওয়াত খাওয়া জানি ন্যা!
- দাওয়াত খাওয়া লাগবি না।
- ঠিক আছে, দাওয়াত না খাওয়াইস বৌ দেখা, এমন একখান বৌ পাইলি, সঙ্গে একখান গাইও পাইলি, আমাগোরে দেখা, আমরা কি তর বৌয়েক খায়া ফালায়া দিমুনি!
- বৌ কি এই বালের ক্ষেতের মইদ্দে আইন্যা তোমাগোরে দেখাইন নাইগব! বৌ দেখা নাগে, বাড়িত যায়া দেইখো।

আকালুর বৌয়ের সঙ্গে সুহাসিনীর লোকদের দেখা হয়, তারা তার শ্বশুর আইজ্জল প্রামাণিকের দেয়া গরুর বকনা বাছুরটাও দেখে। স্বামীর বাড়ি আসার পর ফাতেমা দ্রুত ঘোমটার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে, সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর থেকে তার ভরাট স্তন, বিস্তৃত নিতম্ব এবং মোটা পায়ের গোছা প্রকাশিত হয়; গ্রামের লোকেরা চলতে ফিরতে দেখে, তারা বলে, ক্যারে আকালু, এমন বৌ বিয়্যা কইরলি, এমন ধামার নাহাল তর বৌয়ের শরীল!

ফাতেমা হারিয়ে যাওয়ার পর, যখন তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন সুহাসিনীর লোকদের গ্রামের মসজিদের প্রাক্তন মুয়াজ্জিন, চান্দাইকোনা মাদ্রাসার দাখিল ক্লাশের তালেবুল এলেম রফিকুল ইসলামের কথা মনে পড়ে। সে মিঞা বাড়িতে জাইগির থাকতো, গ্রামের বাচ্চাদের আরবি পড়াতো এবং মসজিদের ইমাম, মোহসিন আলিকে আজান দিয়ে সাহায্য করতো । ফাতেমা তার যমজ সন্তান বকুল এবং আমির হোসেনকে যখন মসজিদে পাঠাতে চায় রফিকুল ইসলামের কাছে কোরাণ শরিফ পড়ার জন্য, আকালু প্রথমে গ্রাহ্য করে না, তখন ফাতেমা খাওয়ার ধান চুরি করে রফিকুল ইসলামকে দুই খাদি ধান দিয়ে দেয়। রফিকুল ইসলাম ধানঘড়ার হাটে এই ধান বেচে দুটো কায়দা, দুটো সেপারা এবং

একটা সহজ নামাজ শিক্ষা কিনে আনে। বকুল এবং আমির হোসেন আলিফ বে তে সে শিখতে শুরু করার কয়েকদিন পর আকালু বিষয়টি টের পায়, সে ফাতেমাকে ধরে।

- ট্যাহা পাইলি কোনে?
- ধান বেইচছি।
- ধান পাইলি কোনে?

ফাতেমা চুপ করে থাকে।

- মাগি, এই কয়ডা ধান শ্যাষ হইলে স্যাটার মইদ্দে কি দেও দেখমুনি, তখন না খায়া থাকা লাইগবনি গুষ্টি সুদ্দা!
- কত না খায়া আছি, তার আবার কথা!
- তর প্যাটতো কোন দিনই ভরে না, মাগি, বাপের বাড়িত থেইক্যা আইন্যা খাইস !

তখন বাপের বাড়ির কথায় ফাতেমার রাগ হয়, সে তার হাতের ভাতের এলুমিনিয়ামের হাড়ি আকালুর দিকে ছুড়ে মারে; এবং তখন সম্ভবত বর্ষাকাল ছিল, বর্ষার পানি আকালুর বাড়ির ভিটার কানার কাছে পৌঁছেছিল; ফাতেমা যখন তার সুপারি গাছের মত সবল হাতে ভাতের হাড়ি ছুড়ে মারে, সেটা আকালুর গায়ে না লেগে উড়ে গিয়ে পানিতে পড়ে। ঝগড়া মিটে যাওয়ার পর ফাতেমা যখন তার হাড়ির খোঁজে ভিটার কিনারায় যায় সে দেখে যে, পানির ওপর বিরাট এক বোয়াল মাছ চিৎ হয়ে ভেসে আছে; বোয়ালটা হয়তো বন্যার পানিতে ভেসে এসে আকালুর ভিটার কাছে কিছু খুঁটে খাচ্ছিল, তখন ফাতেমার ছোড়া এলুমিনিয়ামের হাড়ির আঘাতে এই প্রচীন মাছের মাথার খুলি চূর্ণ হয়ে যায়। আকালু ধানঘড়া হাটে গিয়ে আড়াই হাত লম্বা এই মাছ দেড়শ টাকায় বিক্রি করে আধমন ধান কিনে আনে; একই সঙ্গে সে আতপ চাল আনে, তেল আনে, গুড় আনে এবং ফাতেমাকে বলে, পিঠা তৈরি কর। পরদিন সন্ধ্যায় ফাতেমা চাল বেটে গুঁড়া করে, তারপর চিতই পিঠা বানায়। তখন ফাতেমা রফিকুল ইসলামকে ডেকে আনার জন্য বকুলকে পাঠায়, বলে, যা, তগোরে আরবি পড়ায় অই চ্যাংড়াটাক ডাইক্যা আনগা।

বকুল গিয়ে মিঞা বাড়ি থেকে রফিকুল ইসলামকে ডেকে আনে, রান্না ঘরে ফাতেমা মাটির খোলার ওপর থেকে গরম পিঠা তুলে বকুল, আমির হোসেন এবং রফিকুল ইসলামকে দেয়; তারা গুড়ের শিরার ভেতর ডুবিয়ে পিঠা খায় আর গল্প করে। রফিকুল ইসলাম বলে, বুবু আপনেক একবার বাঘবেড় আমাগোরে বাড়িত নিয়্যা যামু; আমাগোরে বাড়িত খেজুর গাছ আছে, শীতের দিন যখন রস হয় তখন এই রস দিয়া দুধ পিঠ্যা বানাইলে যা মজা, আপনেক শীতের দিনে একবার নিয়্যা যামু, আমার মা খুব মজার পিঠ্যা বানায়।

ফাতেমার কাছে হয়তো এই সন্ধ্যার আয়োজন অন্য রকম আনন্দের মনে হয়, রফিকুল ইসলামের সঙ্গ হয়তো তার ভাল লাগে; সে পিঠা বানায় এবং বকুল, আমির হোসেন এবং রফিকুল ইসলাম খায়। ফাতেমা রফিকুল ইসলামকে সাধে, বলে, খাও, নইজ্জা কইরো না।

পিঠা বানাতে বানাতে ফাতেমার চালের গুঁড়া ফুরিয়ে যায়, তখন তার খেয়াল হয় যে, আকালু বাকি রয়ে গেছে। তখন সে পুনরায় চাল ভিজিয়ে বেটে গুঁড়া করতে বসে এবং তখন আকালু মিঞা বাড়ির কাচারি ঘরে তামাক খাওয়ার আড্ডা থেকে ফেরে; সে ফিরে দেখে যে, একটা পিঠাও নাই, ফাতেমা কেবল পাটার ওপর চাল বাটে।

- কি করিস তুই?
- চাইল বাটি।
- এই দুপুর আইতে চাইল বাটিস ক্যা, পিঠা বানাবি কখন!
- বানাইছিল্যাম, ফুরায়া গেছে।
- কেডা খাইলো?

তখন সব শোনার পর আকালু ফাতেমার সঙ্গে ঝগড়া করে, বলে, তর এই ভাতারেক খাওয়ানের নেইগা পিঠ্যা বানাইব্যার কইছিল্যাম!

ঘটনাটা যখন গ্রামের লোক জানতে পারে তখন চান্দাইকোনা মাদ্রাসার তালেবুল এলেম রফিকুল ইসলাম একদিন মিঞা বাড়ির জাইগির ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, কিন্তু সুহাসিনীর লোকেরা তাকে ফাতেমার পিঠা খাওয়ানোর কথা ভোলে না। ফাতেমা হারিয়ে যাওয়ার পর আকালু যখন তাকে খুঁজে পায় না, তখন ধান কাটার অবসরে রৌহার মাঠের ভিতর বসে গ্রামের কৃষক এবং ক্ষেতমজুরেরা বলে, তর বৌয়েক পাইলি?

আকালু কথা বলে না।

- তর বৌ ভাইগ্যা গেছে নাকি দেখ গা।
- কোনে যাইব ভাইগ্যা?
- চান্দাইকোনার মাদ্রাসার ছাত্র, তার কাছে যায় নাই তো?

আকালু পুনরায় চুপ করে থাকে।

- খোঁজ নিয়্যা দেখ।
- তোমরা বাপু কি সব কথা যে কও!

আকালু যখন ফাতেমাকে তেবাড়িয়া থেকে বিয়ে করে আনে, তার সঙ্গে ফাতেমার বাপের দেয়া বকনা বাছুরটাও সুহাসিনীতে আসে। ফাতেমা জাবনা বানিয়ে গরুটাকে খাওয়ায়, গলায় দড়ি দিয়ে বাড়ির কাছের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে খুঁটার সঙ্গে বেঁধে ঘাস খাওয়ার জন্য রেখে আসে; খেয়ে খেয়ে গরুটা নধর চিক্কন

হয়ে ওঠে। সুহাসিনীর লোকেরা তার সঙ্গে যখন পরিহাস করে বলে, বিয়া কইর‍্যা এমন একখান বৌ আনলি, বিয়া কইর‍্যা এমন একখান গরু আনলি, দুইট্যাই একরকম; তখন আকালু বলে, গাইটা বেইচ্যা ফালামু।

- ফালা, তর গাইয়ের দিকে তাকাইলে শালার কাপড় খারাপ হয়া যায়!

কিন্তু গরু বেচে ফেলা আকালুর পক্ষে সম্ভব হয় না, ফাতেমাকে সে যখন এই কথা বলে, ফাতেমা রাতে খুনখুন করে কাঁদে। তখন আকালু নতুন বৌয়ের চোখের পানি দেখে কিছুদিন চুপ করে থাকে, তারপর আবার একদিন বলে, দে, গরুটা বেইচ্যা ঘরে নতুন ছন লাগাই; ফাতেমা শুনে পুনরায় রাতে যখন খুনখুন করে কাঁদে, আকালু আপাতত এই ইচ্ছা বাদ দেয়। কিন্তু একবছর পরেও যখন ফাতেমা এবং তার বাপের বাড়ি থেকে আনা গাভী গর্ভ ধারণ করে না, তখন এরকম মনে হয় যে, আকালুর শ্বশুর আইজ্জল প্রামাণিক হয়তো দুটোই বাঁজা জিনিস দিয়েছে তাকে।

গ্রামের লোকেরা আকালুকে বলে, ক্যারে আকালু, তর হশুর তক বঞ্জা গরু দিল!

- বাঞ্জা নাহি?
- তা নাইলে আর কি, কয় দাঁত হইলো? আর কবে গাবিন হইব?

আকালু রাতে তার বৌকে ব্যাপারটা বলে, এইট্যা বাঞ্জা গরু দিছে তর বাপ,এই গরু আমি বেইচ্যা দিমু।

- বাঞ্জা কইলো কেডা?
- না হইলে গরম হয় না ক্যা? এই গরু আমার লাইগব না, বেইচ্যা দিমু!

ফাতেমার কিছু বলার থাকে না, সে তার বিয়েতে বাপের দেয়া গরু বেচে দেয়ার সম্ভবনায় আবার কাঁদে; তখন আকালু পুনরায় গরু বেচে দেয়া স্থগিত করে। তখন গ্রামের লোকেরা বলে, ক্যারে আকালু, তুই বিয়্যা কইরলি কয় বছর হইলো?

- ক্যা?
- তর হশুর তক বাঞ্জা ম্যায়া দেয় নাই তো?

রাতে আকালু যখন ব্যাপারটা তার বৌকে বলে, তর বাপের দেওয়া এই গাইয়ের নাহাল তুইও বাঞ্জা ম্যায়া নোক নাতো , তখন ফাতেমা অপমানে দুঃখে চুপ করে থাকে।

- কথা কইস না ক্যা ?
- কি কমু!
- কি জিগাস করি ?
- আপনে এইসব কি কথা কন!

- কি কথা কই বুইজব্যার পারিস ন্যা!
- না পারি ন্যা।
- তর বাপ আমাক বাঞ্জা ম্যায়া, বাঞ্জা গাই গছায়া দিছে; তুমি মাগি এত বোজ, এই কথা বোজ না!

তারপর আকালু আরও প্রায় এক বছর অপেক্ষা করে, তখন একদিন আইজ্জল প্রামাণিকের দেয়া বকনাটা গরম হয়; ফাতেমা সেদিন সন্ধ্যায় রাস্তা থেকে গরু ঘরে আনতে গিয়ে ব্যাপারটা খেয়াল করে । পরদিন আকালু গ্রামপাঙ্গাসি নিয়ে গিয়ে ফাতেমার এই কাজলা গাইকে পাল দেখিয়ে আনে এবং এর কিছুদিন পর আকালু ফাতেমার গর্ভবতী হওয়ার খবর পায়। এই দুই যুবতী প্রাণীর একসঙ্গে গর্ভধারণের ঘটনায় আকালু হয়তো অবাক হয় না, অথবা হয়তো হয়; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর যখন উভয়েই যমজ বাচ্চা প্রসব করে তখন আকালুর শুধু একার নয়, সুহাসিনীর সকল লোকের বিস্ময় হয়; তারা আকালুকে বলে, ক্যারে, তর হশুরতো দেখি তক ভালই ম্যায়া দিছে, ভালই গাই দিছে, দুই জন একই রকম দেইখতে, আবার দুই জনেই একসঙ্গে দুইখান কইর‍্যা বাচ্চা দেয়!

আকালু তখন বিষয়টা আরো ভাল করে ভেবে দেখে; ফাতেমার দুটো বাচ্চা হয়, একটা ছেলে একটা মেয়ে, কাজলি গাভীরও দুটো বাছুর হয়, একটা এঁড়ে একটা বকনা। সে বলে, আসলেই!

আকালু তার ছেলেমেয়ের নাম রাখে, আমির হোসেন এবং বকুল, অবসর সময়ে সে তার মেয়েকে ডাকে, আয়রে আমার বকুল ফুল; ফাতেমা কাজলা গরুর দুই বাছুরের নাম রাখে, ময়না এবং টিয়া; সে জাবনার চাড়িতে ভুসি গুলে দিয়ে ডাকে, আয় ময়না পক্ষি, টিয়া পক্ষি।

কিন্তু ময়না টিয়া একদিন তার মায়ের সঙ্গে হারিয়ে যায়; সকালে উঠে ফাতেমা গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখে যে, কাজলা গাই এবং ময়না টিয়া নাই, গোয়ালঘর শূণ্য। প্রথমে তার মনে হয় যে, আকালু হয়তো গরুগুলোকে মাঠে নিয়ে গেছে, কিন্তু আকালু বলে যে, সে গরু মাঠে নিয়ে যায় নাই। তখন, গরু গেল কনে, গরু গেল কনে, করতে করতে আকালু এবং ফাতেমা খোঁজাখুঁজির করে, বাড়িঘর মাঠ বিল খোঁজা হয়, কাজলি এবং ময়না টিয়াকে আর পাওয়া যায় না। ফাতেমা সারারাত খুনখুন করে কাঁদে, পরদিনও কাঁদে, তার পরদিনও; আকালু শোনে আর ধমকায়, বলে, কানের কাছে খুনখুন করবি না!

তখন আউসের ক্ষেতে নিড়ানির কাজ করতে করতে, অথবা পাট কেটে জাগ দিতে দিতে, অথবা আমনের জন্য জমি চষতে চষতে, অবসরে, সুহাসিনীর কৃষকেরা তামাক খায় এবং গল্প করে।

- ক্যারে আকালু, তর হশুরের দেওয়া গাইডো হারায়া গেল!
- হেঁ, খুঁইজ্যা পাই ন্যা।
- কোনে খুঁইজলি ?
- সারা গাঁওয়েই তো খুঁইজল্যাম!
- এই রকম গাঁওয়ের মইদ্দে থেইক্যা গরু হারায় শুইনছিস কোনো দিন!
- হারাইলে আমি কি করমু!
- তর তিন তিনট্যা গরু এইরকম কইর‍্যা হারায়া গেল আর তুই বইস্যা বইস্যা তামাক খাইস, কইস, আমি কি করমু!
- সারা গ্রামে খুঁইজল্যাম পাইল্যাম না, পাঙ্গাসি যায়া খোঁয়াড়ে খুঁইজল্যাম, নাই; এখন কি করমু, গরু খোঁজার নেইগ্যা এখন কোনে যামু!
- এই রকম কইর‍্যা কারু গরু হারায়?
- হারায় না ?

তখন গ্রামের কৃষকেরা পুনারায় কাজে উঠে যেতে যেতে যখন বলে, তুই বেইচ্যা দিস নাই তো, রাইতের বেলা পঙ্গাসি হাটের পাইকাররা আইস্যা নিয়্যা যায় নাই তো, তখন আকালু চুপ করে থাকে, তার হয়তো মনে হয় যে, এইসব কথার উত্তর হয় না। গ্রামের কৃষকেরা তাকে পুনরায় যখন বলে, তর এত লোভ ক্যা, তখন আকালু ক্ষেপে যায়, তোমরা বাপু এত কথা কও ক্যা, আমার গরু বেইচপের চাইলে আমি চুরি কইর‍্যা বেচমু ক্যা!

ফাতেমা হারিয়ে যাওয়ার পর গ্রামের কৃষকেরা প্রতিদিন আকালুকে মাঠে পায়; তাদের আকালুর বৌয়ের শরীরের কথা মনে পড়ে, এবং ফাতেমার শরীরের কথা মনে হলে তাদের আকালুর শ্বশুরের দেয়া কাজলা গাইয়ের কথা মনে হয়; এই গাভীটির পিছন দিকে তাকালে তাদের মনে হতো যে, তাদের অজু নষ্ট হয়ে যাবে; এবং এই গাভীটির কথায় তাদের ফাতেমার কথা মনে পড়ে, সবল এবং অপরিমিত যৌবনবতী ছিল এই নারী; এবং এই নারীর সঙ্গে তার বাপের বাড়ির কাজলা গরুর এক সম্পর্ক ছিল। তারা পুনরায় তামাক খাওয়ার ফাঁকে আকালুকে তার নিখোঁজ স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করে, ক্যারে আকালু, কোন খোঁজ পাইলি?

- না।
- এইরকম কইর‍্যা একটা মানুষ উধাও হয়া গেল, এইট্যা কোন কথা হইলো!
- কি করমু আমি তোমরাই কও!
- কি আর করবি, বইস্যা বইস্যা কামলা দে আর তামুক খা , আর কি করবি!

তখন আকালু পুনরায় কাঁদে, তা দেখে গ্রামের কৃষকদের হয়তো করুণা হয়, হয়তো হয় না; তারা বলে, তর বৌয়েক বেইচ্যা ফালাইস নাইতো !

- বৌ বেইচ্যা ফালাইছি! কোনে বেইচছি?
- সিরাজগঞ্জ নিয়্যা যায়া নডি বাড়িত বেইচ্যা দিছিস, তর বৌয়ের যা শরীল আছিল, ভাল পয়সা দিছে তক!
- হেঁ, পয়সার নেইগ' আমি বৌ বেইচ্যা দিমু!
- ক্যা, পয়সার নেইগ' তর বৌয়ের বাপের বাড়ির গরু চুরি কইর‍্যা বেইচ্যা দিস নাই ?
- গরু আর মানুষ এক হইলো! গরিব হইছি দেইখ্যা বৌ বেইচ্যা দিমু, কেউ দেয় ?
- দেয় না? ঠিক আছে, তুই না দিয়্যা থাইকলে এই রকম গরুর নাহাল আর বইস্যা না থাইক্যা থানায় যা; একলা যাওয়ার সাহস না পাইস ছোট মিঞাক সঙ্গে নিয়্যা যা।
- ছোট মিঞ্যা কি যাইব?
- যাইব না ক্যা, তর বৌয়েকতো খুব পছন্দ কইরতো আলতাফ হোসেন, এখন যাইব না ক্যা!

গ্রামের লোকদের পরামর্শ অনুযায়ী আকালু রায়গঞ্জ থানায় যায়; কিন্তু মিঞা বাড়ির ছোট ছেলে আলতাফ হোসেন সঙ্গে যায় না, সে আকালুর কথা শুনে ক্ষেপে যায়, বলে, আমার বালের ঠেকা পইড়ছে থানায় যাওয়ার নেইগ্যা; এবং তারপর সে গ্রাম থেকে উধাও হয়, তখন আকালুকে একাই যেতে হয়। রায়গঞ্জ থানার ডিউটি অফিসার সব শুনে চুপ করে থাকে, তার সামনে এক সঙ্কট দেখা দেয়, মামলা নিলে তা নারী অপহরণ অথবা খুনের মামলায় দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তাতে থানার পরিষ্কার রেকর্ডের ক্ষতি হয়। সে বলে, তাইলে মামলা দিবেন ?

- আপনে যা কন, ছার।
- আপনের বৌয়ের কি হইছে তাইতো বুঝতে পারলাম না।

আকালু চুপ করে থাকে।

- আপনের নাম কি ?
- আকালু শ্যাক।
- বাপের নাম কি ?
- জহিরদ্দি মোল্লা ।
- আপনে কি করেন?
- কাম করি ছার।
- কি কাম?

- কিষি কাম করি।
- জমি আছে কয় বিঘা?
- আমার কোন জমি নাই ছার, অন্য মাইনষের জমিত কামলা দেই।

থানার ডিউটি অফিসার এবং ছোট দারোগার আর কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে না,আকালু ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এটা বুঝতে পারার পর সে নিশ্চিত হয় যে, এই হারিয়ে যাওয়া নারীর বিষয়ে কিছু আর করার নাই; তখন সে আকালুকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলে; সে বলে যে, কেস হলে তদন্ত করতে হবে, তদন্ত করতে গেলে লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, কত লোককে হয়তো হাজতে নিয়ে রাখতে হবে, হয়তো আকালুকেও হাজত বাস করতে হবে; তখন এ এক মহা ঝামেলা হবে। সে আকালুকে বলে, কয়েকদিন অপেক্ষা কইরা দেখেন, হয়তো কোনখানে গেছে, আইসা পরবো!

কিন্তু ফাতেমা আর ফিরে আসে না।

আকালু মন খারাপ করে মাঠের কাজ করে, বকুল এবং আমির হোসেন একা একা বাড়ির প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ায়, তারা সকালে উঠে অজু করে মসজিদে যায় কায়দা এবং সেপারা পড়ার জন্য। চান্দাইকোনা মাদ্রাসার তালেবুল এলেম রফিকুল ইসলাম চলে যাওয়ার পর থেকে জুমা মসজিদের ইমাম মোহসিন আলি আরবি পড়ানোর এই কাজও করে। তার সামনে বসে গ্রামের এই ছেলেমেয়েরা ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ে, আলিফ বে তে সে; পড়ে, আলিফ জবর আ আলিফ জের ই আলিফ পেশ উ, আ ই উ; পড়ে, কুল হু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহু সামাদ ...। গ্রামের বৃদ্ধ কৃষক এবং জুমা মসজিদের ইমাম মোহসিন আলি বলে, ক্যারে বকুল, আস্তে পড়িস ক্যা, জোরে পড়।

বকুল তখন কাঁদে।

- কান্দিস ক্যা, ক্যারে গেদি !
- আমার মাওটা হারায়া গেল, দাদা মিঞ্যা, আর ফির্যা আইসলো না ।
- আইসপনি দেহিস, কান্দিস ন্যা।
- কখন আইসপ, মা মইর‍্যাই গেছে !

তখন মোহসিন আলি মৌলবির হৃদয়ে এই বালক-বালিকার জন্য মমতা জেগে ওঠে, সে তার পাঞ্জাবির খুঁট দিয়ে বকুলের গালের ওপর নেমে আসা অশ্রু মুছে দেয় ।

- তর মা মইর‍্যা গেছে কেডা কইলো ?
- তাইলে আসে না ক্যা ?

মোহসিন আলি মৌলবি তখন সাত বছর বয়সের এই বালিকার সঙ্গে এক খেলায় নিয়োজিত হয়, সে তাকে বলে যে, সে বলে দিতে পারে তার মা বেঁচে

আছে না মরে গেছে; এবং বকুল যখন বলে, কন না দাদা মিঞা, তখন মোহসিন আলি এই বালক-বালিকাকে খেলার বিষয়টা বুঝিয়ে বলে।

- এইন একটা গাছ লাগাইন লাইগবো, ঠিক আছে?
- আচ্ছা।
- কি গাছ লাগন যায় ক দেহি।
- আম গাছ লাগান, দাদা মিঞা।
- না, আম গাছ না।
- তাইলে জাম গাছ লাগান।
- না, জাম গাছও না।
- তাইলে গাব গাছ লাগান।
- না, গাব না।
- তাইলে, আপনে কন।
- না, তরা ক ।
- তাইলে সুপারি ।
- না, সুপারি না।
- তাইলে লেবু গাছ।
- না, লেবুও না।
- তাইলে কলা গাছ লাগান।
- হেঁ, আমরা কলা গাছ লাগামু।

তারপর সেদিন বিকালে মোহসিন আলি আকালুর ভিটায় আসে, সে দেখে যে, আকালুর ছনের ঘরে বাঁশের মাচার ওপর বকুল এবং আমির হোসেন ঘুমায়; সে তাদেরকে ডেকে ওঠায়, ক্যারে বকুল, ক্যারে গেদি, যাবি ন্যা ? তখন বকুল এবং আমির হোসেনকে সঙ্গে করে মোহসিন আলি বের হয়। সুহাসিনীর লোকেরা দেখে যে, তাদের জুমা ঘরের ইমাম মোহসিন আলি নিখোঁজ ফাতেমার ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের ভেতর দীর্ঘক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, তারপর তারা রব্বেল ডাক্তারের বাড়ির বিচি কলার ঝোপ থেকে একটা চারা সংগ্রহ করে আনে। মোহসিন আলি, আকালুর বাড়ির পিছনে, ভিটার কিনারায় খুঁজে খুঁজে একটা নরম ভিজা জায়গায় কলার চারাটা লাগায়, বকুল এবং আমির হোসেন তার সঙ্গে থাকে। মোহসিন আলি বলে, তরা আলহামদু সুরা পড়, তিনবার পইড়্যা গাছে ফুঁ দে।

তখন তারা তিনজন আকালুর ভিটার পিছনে গাছপালার ছায়ার ভেতর বুকের ওপর দুই হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে সুরা পাঠ করে, আউজুবিল্ল্যা হি মিনাশ শায়তনের রাজিম, বিসমিল্ল্যা হির রহমানির রাহিম ...আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল

আলামিন ...। মোহসিন আলি তখন বকুল এবং আমির হোসেনকে পুনরায় নিয়মগুলো বুঝিয়ে বলে; সে বকুল এবং আমির হোসেনকে বলে যে, এই গাছটাতে কোন দিন পানি দেয়া হবে না, তারপরও যদি গাছটা বেঁচে থাকে তাহলে বোঝা যাবে ফাতেমা মা বেঁচে আছে, সে ফিরে আসবে; আর যদি গাছটা মরে যায় ...।

কিন্তু গাছটা মরে না।

গ্রামের লোকেরা জুম্মা ঘরের বুড়ো ইমাম, মোহসিন আলির চালাকি বুঝতে পারে, কিন্তু বকুল এবং আমির হোসেন বোঝে না ; তারা এই গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিচিকলার চারাটা শুকনোর দিনগুলা চুপচাপ পড়ে থেকে কাটায়, পরবর্তী বর্ষায় সেটা দ্রুত জেগে ওঠে; কয়েকদিনের ভেতর এই গাছ এমন সবল এবং লম্বা হয়ে ওঠে যে, গ্রামের যারা দেখে তারা বিভ্রান্ত হয়, তাদের মনে হয় যে, বুড়ো মৌলবি কি এই জন্যই ফাতেমার নামে পৃথিবীর সব গাছ রেখে খুঁজে খুঁজে বিচিকলার গাছ লাগিয়েছিল ! তারা যখন এই গাছের গোল এবং স্ফীত হয়ে ওঠা গুঁড়ির দিকে তাকায়, ঢলোমলো পল্লবকাণ্ডের দিকে দেখে, তাদের এক নারীর কথা মনে পড়ে; তারা নিশ্চিত হয় যে, এই নারী ফাতেমা, এবং আকালুর বাড়ির ভিটার পিছনে কখনো বিচিকলার ঝোপের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনীর লোকদের হারিয়ে যাওয়া ফাতেমার জন্য মন খারাপ লাগে। বকুল এবং আমির হোসেন সকালে কিংবা দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় ভিটার পিছনে কলা গাছের কাছে যায় এবং তারা ক্রমে এই গাছের সঙ্গে কথা বলা শুরু করে।

- ক্যা মা, তুই আর ফিরা্যা আসপি ন্যা?
- ক্যা, আসপি ন্যা ক্যা?
- আমাগোরে খারাপ নাগে না বুজি তর নেইগ্যা?

সময় যখন পার হতে থাকে বিচিকলা গাছের কুশি গজিয়ে ঝোপ হয়ে ওঠে, আকালু বিরক্ত হয়: সে যখন বলে, বিচ্যা কলা বেচা যায় না , দাম নাই, এই গাছ কাইট্যা ফালামু, তখন বকুল খুনখুন করে কাঁদে, আমির হোসেন খুনখুন করে কাঁদে; তখন আকালুকে বিচিকলা গাছ কেটে ফেলার পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়। সে বলে, মোহসিন আলি চাচা মিঞ্যা তগোর নগে তামাশা কইরছে, তরা যে গাছ লাগাইছিলি তা কবে মইর‍্যা গেছে।

- না মরে নাই।
- মরে নাই, তরা কয়টা গাছ লাগাইছিলি?
- একটা।
- এহন কয়টা গাছ?
- অনেক।

- তরা যে গাছটা ল'গাইছিলি সেইট্যা কি আছে?
- ক্যা, নাই?
- কবে কলা ধইর‍্যা মইর‍্যা গেছে সেই গাছ, এহন যেগুলি দেহিস এইগুলা অইন্য গাছ, আগেরটা না।

তখন অনেক দিন কাটে, মৌলবি মোহসিন আলির মৃত্যু হয়, আকালু আবার বিয়ে করে এবং ফাতেমার কথা সবাই ভুলে যায়। আকালু চান্দাইকোনা থেকে যেদিন পুনরায় বিয়ে করে ফেরে, সেদিন গ্রামের লোকেরা এক পুরানো দৃশ্য দেখে; এবার লক্ষ্মীকোলার ভিতর দিয়ে আকালু হেঁটে আসে, তার হাতে দড়িবাঁধা একটা কালো রঙের গরু, এবং এই গরুর পিছনে ঘোমটা টানা এক মেয়ে, সখিনা, আকালুর নতুন বিয়ে করা বৌ।

সখিনাকে বিয়ে করে আনার পরদিন গ্রামের মাঠে সুহাসিনীর কৃষকদের সঙ্গে আকালুর দেখা হয়, তারা পুনরায় কাজ করে, হুঁকা খায় এবং গল্প করে।

- ক্যারে আকালু, তর কপালই ভাল; আবার বৌ পাইলি, গাইও পাইলি।
- এত কথা কও ক্য তোমরা!
- ঠিক আছে, বিয়্যা করলি বৌ দেখা।
- বৌ কি তোমাগোরে এই বালের ক্ষেতের মইদ্দে আইন্যা দেখাইন নাইগব?
- বৌ দেখাবি ন্যা?
- বৌ দেখা নাগে বাড়িত যায়া দেইখো।

তখন আকালু পুনরায় বিচিকলার ঝোপ কেটে ফেলার চেষ্টা করে, বকুল এবং আমির হোসেন পুনরায় খুনখুন করে কাঁদে; সব শুনে সখিনা বলে, থাইক ন্যা।

- বিচিকলার কোনো দাম আছে? মোহসিন চাচা মিঞ্যা তামশা কইরছে, আর এই ছাওয়াল ম্যায়া তাই ধইর‍্যা বইস্যা রইছে!
- থাইক ন্যা, ভিট্যার এক পাশে পইড়া অইছে, থাইক।
- এইগুলিতো সেই গাছ না, সেই গাছ কবে মইর‍্যা গেছে!

কিন্তু বিচিকলার ঝোপের গাছগুলো দেখে বকুল এবং আমির হোসেনের মনে হয় যে, এগুলো একই গাছ, একই রকম দেখতে, সবুজ সবল এবং কান্তিময়; তারা এই গাছের সঙ্গে কথা বলে বড় হয়ে ওঠে। তখন, বকুল শাড়ি পরা শুরু করার পর গ্রামের লোকদের পুনরায় বহুদিন পর ফাতেমার কথা মনে পড়ে; এগার/বার বছর বয়স হওয়ার আগেই বকুল লম্বা হতে থাকে , তার নগ্ন পায়ের গোছা মোহসিন আলি মৌলবির লাগানো বিচিকলা গাছের মত মোটা এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ স্ফীত ও বিস্তৃত হয়ে ওঠে। গ্রামের লোকেরা যখন বলে, তর ম্যায়াটা তর হারায়া যাওয়া বৌয়ের নাহাল হইছেরে আকালু, তখন বকুল হয়তো

ব্যাপারটা বোঝে অথবা কিছু বোঝে না; কিন্তু সে রান্না ঘরে মাচানের ওপর যখন শোয় শাড়িতে তার শরীর ঢাকা পড়ে না, সে যখন গোসল করার সময় গা মাজে তার করতলের ভেতর তার নিজের কালো দেহের বিস্ময় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। তখন একদিন রাতে মাচার ওপর শুয়ে সে তার পেটের ব্যথাটা টের পায়, ব্যথা অল্প অল্প করে বাড়ে, তারপর তার মনে হয় যে, তার তলপেট ছিঁড়ে গেল; এবং তখন বকুলের কাপড় ভিজে যায়। সেরাতে এক বিহ্বলতার ভেতর বকুল রান্না ঘরের মাচা থেকে নেমে ভিটার পিছনে বিচিকলার ঝোপের দিকে যায়, সেখানে সে একটা মোটা কলাগাছের গোড়া জড়িয়ে ধরে মাটির ওপর কাত হয়ে পড়ে থাকে, মা মা, বলে কাঁদে; তখন বিচিকলা ঝোপের ভেতর লাল পিঁপড়া প্রতীক্ষায় ছিল, তারা তাদের ঢিপি ছেড়ে উঠে আসে।

পরদিন সকালে গ্রামের যারা আকালুর ভিটার পিছন দিকে যায় তারা বিচিকলার ঝোপের কাছে বকুলের রক্তাক্ত শাড়ি পড়ে থাকতে দেখে; সুহাসিনীর লাল পিঁপড়া বকুলকে খেয়ে যায়।

২০০০

# মহল্লায় বান্দর, আব্দুল হালিমের মা এবং আমরা

ভূতের গলির লোকেরা বানর নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা দেয়ালের ওপর অথবা দূরে ছাতের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকা এই খয়েরি রঙের জানোয়ারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, বান্দর বান্দর, ওই যে বান্দর!

তখন হয়তো কখনো ভূতের গলির লোকেরা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, হয়তো প্রসন্ন হয়ে বলে, হয়তো জটিল সময়ের ভেতর কাহিল হয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে। একাত্তর সনের ঘটনা ২ মার্চের পর থেকে যখন দেশে ঘটতে থাকে, যখন রাতে ঢাকা শহরে কার্ফু জারি করা হয়, টিপু সুলতান রোড দিয়ে ছুটে যাওয়া ভারি মিলিটারি গাড়ির চাকার গোঙানি এবং গুলির ফট ফট আওয়াজ নীরবতাকে বিদীর্ণ করে, এবং যখন ২৫ তারিখের রাতে নয়াবাজারের কাঠের গোলা পুড়তে শুরু করে তখন ভূতের গলি তার বাইরে থাকে না; ভূতের গলিতেও অবধারিতরূপে একাত্তর সন নেমে আসে এবং তখন আব্দুল হালিম এই সময়ের পাকচক্রে ধরা পড়ে; আহারে আব্দুল হালিম, আহারে আমার পোলা, বলে তার মা হয়তো কাঁদে, নীরবে বিলাপ করে, মহল্লার লোকেরা হয়তো এই কান্নার শব্দ শুনতে পায় অথবা পায় না। অথবা হয়তো তার মা আর কাঁদে না, হয়তো এতদিন পর ভূতের গলির লোকেরাও আব্দুল হালিমের কথা ভুলে যায় অথবা হয়তো তারা একেবারে ভুলে যায় না, হয়তো তাদের আব্দুল হালিমের যুদ্ধ যাত্রার স্মৃতি স্মরণে আসে। মহল্লার ওপর দিয়ে দীর্ঘ সময়ের স্রোত বয়ে যায় এবং এবং কাছেই যেমন বুড়িগঙ্গা দিয়ে যায় পানি, তবু, কখন কখন মহল্লার লোকদের হয়তো আব্দুল হালিমের কথা মনে পড়ে, এবং তখন তারা বলে, হালায় পাগল আছিল এউকগা; ভূতের গলির লোকেরা সকলকেই, হালা এবং পাগল বলে, এবং পরিবর্তিত সময়ের ভেতর অর্থহীন কলরব করে; তারা লেদ মেশিন চালায় অথবা দোলাইখালের রাস্তায়

পুরানো মটর গাড়ির পার্টসের দোকানদারি করে, বিকাল বেলা হয়তো বুড়া বিহারির দোকানে বসে চা খায় এবং কথা বলে, এই হালায় মান্দার পোলা ..!

মহল্লার লোকেরা বলে যে, ভূতের গলিতে আগেও বানর ছিল। যারা মহল্লার পুরাতন বাসিন্দা তারা মনে করতে পারে যে, একসময় তারা মহল্লায় অনেক বানর দেখেছে, ছাতের ওপর থেকে এই লাল টকটকে পশ্চাৎদেশওয়ালা জানোয়ারেরা দেয়াল বেয়ে নেমে এসে অরক্ষিত কোন রান্নাঘর থেকে হরলিক্সের বোতল বগলদাবা করে নিয়ে যেত। তখন মহল্লার ছোট ছেলেমেয়েরা বানরের পিছনে ছুটতো, দূরে কোন বাড়ির ছাতের কার্নিশের ওপর বসে থাকা বানরের দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেংচি দিত, ছড়া কাটতো, বান্দর বান্দর ভেংচি, তর লাল পুটকি দেখছি! তবে কালক্রমে ভূতের গলি থেকে বানর অবলুপ্ত হয়ে যায়, কেন হয় তা গলির লোকেরা জানে না; পরে তারা বলে, তারা বস্তুত বুঝতেই পারে নাই যে মহল্লায় বান্দর নাই, এবং তারা বহুদিন বান্দর দেখে না। এভাবে বহুদিন কাটানোর পর মহল্লায় প্রথম বানর ফিরে আসে, এবং মহল্লার লোকেরা সচেতন হয়, তারা যখন বুঝতে পারে যে, সত্যি একটি অথবা একাধিক বানরের আগমন ঘটেছে, তারা ভেবে পায় না এই বানর কোথেকে এল; এই হালার বান্দরেরা আইলো কইথন, তখন তারা বলে। তারপর তাদের মনে হয় যে, বানর হয়তো দয়াগঞ্জ থেকে এসেছে, হয়তো গেন্ডারিয়ার দীননাথ সেন রোডের গলি থেকে এসেছে; তবে মহল্লায় এতদিনের বানরহীনতায় অভ্যস্ততার কারণে তারা এদের আগমনের বিষয়টি প্রথমে বুঝেও মনে হয় যেন না বুঝে থাকে। তখন কোন একদিন চন্দ্রকান্তদের পাশের বাড়ির ভাড়াটে নূরুল হকের যুবতী স্ত্রী শিশু পুত্রের কান্না শুনে রান্না ঘরে চুলার ওপর তরকারির হাঁড়ি ফেলে ঘরে আসে, তারপর কান্না থামিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে সে যখন পুনরায় রান্নাঘরে ফিরে যায় সে ভালমত খেয়াল করে না, তরকারি রেঁধে নামায়, ডাল রাঁধে, তারপর কুয়া থেকে দড়ি বাঁধা বালতিতে করে পানি তুলে গোসল করে ঘরে ফিরে অপেক্ষা করে। তখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠলে পোস্তগোলার ফুড ডিপার্টমেন্টের অফিস থেকে তার স্বামী আসে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। ঘরের ভেতর চৌকির ওপর মাদুর পেতে সে খাওয়ার আয়োজন করে, রান্না ঘর থেকে বাটিতে করে তরকারি আনে, ডাল আনে, তারপর যখন গামলায় ভাত বাড়ার জন্য ভাতের হাঁড়ি নামাতে দেয়ালের তাকের কাছে যায় সে দেখে যে, তাক খালি, ভাতের হাঁড়ি নাই। তখন, ভাতের হাঁড়ি গেল কোনে, ভাতের হাঁড়ি গেল কোনে, বলে সে ভাতের হাঁড়ি খোঁজে। সেদিন দুপুরে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে রান্না ঘরের আনাচকানাচ, কুয়াতলা, ঘরের পাশের গলি সব তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে, কোথাও কিছু নাই; ভাতও নাই, এলুমিনিয়ামের হাঁড়িও নাই। প্রথমে তখন তাদের কাছে ব্যাপারটা ভৌতিক বলে

মনে হয়, তারপর তাদের মনে হয় যে, রুনু যখন ছেলের কান্না থামানোর জন্য রান্নাঘর ফেলে ঘরে গিয়েছিল তখন কোন তস্কর ফকির অথবা ফকিরনি গলি দিয়ে ভিতর বাড়িতে ঢুকে দেয়ালের তাক থেকে দ্রুত ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে নিয়ে গেছে। নূরুল হক যখন সব বুঝতে পারে সে তার স্ত্রীর অসতর্কতার জন্য গালমন্দ করে, বলে, ব্যাক্কেল, এবং তখন রুনু ভাত রাঁধার জন্য পুনরায় চুলায় হাঁড়ি চাপায়।

মহল্লার পশ্চিম দিকের আকাশ যেদিন রাতে নয়াবাজারের আগুনের লাল ভৌতিক আলোয় ভরে যায় এবং মহল্লার লোকেরা ভয় এবং বিহ্বলতার ভেতর শেষ রাতের ঘুম থেকে জেগে ওঠে, বন্দুক ও মেশিন গানের গুলির শব্দ এবং দূরবর্তী বিপদাপন্ন মানুষের চিৎকার শোনে, তারা তখন বুঝে উঠতে পারে না তারা কি করবে। তারা কার্ফুর ভেতরে মহল্লার রাস্তার ওপর বের হয়ে আসে এবং একে-ওপরকে জিজ্ঞেস করে, এ্যালা কি অইবো? তাদের এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত কউকে পাওয়া যায়না, মনে হয় যেন তারা উত্তর পাওয়ার জন্যও এই প্রশ্ন করে না, তারা এমনি ঘটনার ভয়াবহতার উপলব্ধির কারণে বিচলিত হয়ে পড়ায় এভাবে কথা বলে। তখন মহল্লার লোকেরা আব্দুল হালিমকে তাদের বাড়ির গেটের সামনে গলির রাস্তার ওপর দেখে, তারা বলে, কি মিঞা লাঠি লয়া কুজকাওয়াজ করলা এতদিন অখনে কি করবা, অখনে তো মাইরা শ্যাষ কইরা ফালাইবো! আব্দুল হালিম তাদের কথা শুনে চুপ করে থাকে, হয়তো দূরবর্তী লেলিহান আগুনের প্রবল ক্রুদ্ধ লাল আভা দেখে সে ভয় পায়, হয়তো তার এমনিতেই কিছু বলার থাকে না। সলিমুল্লাহ কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে লুঙ্গি মালকোঁচা মেরে কাঁধের ওপর রাইফেলের মত বাঁশের টুকরো নিয়ে লেফট-রাইট করায় এক ধরনের মজা ছিল, হয়তো এক ধরনের বিদ্রোহের প্রকাশও ছিল, এখন মহল্লার লোকদের এই প্রশ্নের সামনে সে চুপ করে থাকে। সেদিন রাতে মহল্লার লোকেরা পুনরায় যার যার বাসায় ফিরে যায়, এবং শেষ রাতের দিকে হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর সকালে যখন তাদের ঘুম ভাঙে তারা বুঝতে পারে যে, তাদের ফজরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে, কারণ মহল্লার মসজিদের মুয়াজ্জিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ভয়ে মাইকে শব্দ করে আজান দেয় না এবং মসজিদের ইমাম মওলানা নুরুজ্জামান কেবলমাত্র মুয়াজ্জিনকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামজ পড়া শেষ করে। লোকেরা যখন এই কথা শোনে তারা জুমা ঘরের পিছনে নুরুজ্জামান মওলানার বাসায় যায় এবং বলে, হুজুর আপনেও এমুন করলেন, আপনেও ডরাইলেন! তখন মওলানা নূরুজ্জামানের চেহারা বিষণ্ন হয়ে ওঠে, সে বলে যে, আসলে তারও ভয় হয়েছিল, কারণ সেও মানুষই, তার মনে হয়েছিল যে, উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ এই জন্তুদের সামনে নীরবতা হয়তো মঙ্গলকর হবে। মহল্লার লোকদের ভেতর যারা তখন অলিগলির মধ্য দিয়ে লুকিয়ে লালচান মকিম লেনের সামনে নবাবপুর রোডের

ওপর গিয়ে ওঠে তারা দেখে যে, কার্ফুর ভেতরই ঢাকার মানুষের ঢল বুড়িগঙ্গার দিকে যায়। দুই দিনের ভেতরে ভূতের গলির লোকও প্রায় সাফ হয়ে আসে এবং মহল্লার লোকেরা বলে যে, আব্দুল হালিম এই সময় কোন একদিন হাসিনা আকতার ঝর্ণার দিকে তাকায়।

এই সময় মহল্লার লোকেরা প্রথমে নেপাল চন্দ্রের ভাড়াটে নূরুল হকের রান্না ঘর থেকে ভাতের হাঁড়ি হারিয়ে যাওয়ার কথা শোনে, এবং তাদেরও মনে হয় যে, এটা কোন ফকির কিংবা ফকিরনিরই কাজ, বেকুব বৌটার বেখেয়ালের কারণে ফাঁকা রান্নাঘরে কেউ ঢুকে হাঁড়িটা নিয়ে দ্রুত গলি দিয়ে বের হয়ে গেছে। কিন্তু তখন বাঘওয়ালা বাড়িতে চুরি হয়, এই বাড়ির মালিক আব্দুর রহিম মিঞা কোন একদিন দুপুরে অথবা বিকেলে যুগিনগরে তার 'রহিম এন্ড কোং প্লাস্টিক ইন্ডাঃ লিঃ' থেকে ফিরে কলতলায় মুখ ধুতে যায়, সে কলের পাশে একটি নিচু দেয়ালের ওপর তার হাতের সিটিজেন অটোমেটিক কোয়ার্জ ঘড়িটা খুলে রেখে প্রক্ষালণ কর্ম সম্পন্ন করে ঘরে ফিরে আসে, কিন্তু সে তার ঘড়িটার কথা ভুলে যায়। বিকেলে ঘুম থেকে ওঠার পর তার ঘড়ির কথা মনে পড়ে, তখন তার স্ত্রী পারভিন কলতলায় গিয়ে দেয়ালের ওপর ঘড়ি দেখতে পায় না, সে চিৎকার করে, দেখি নাতো কুনো ঘড়িউড়ি, নাইতো এইখানে কিছু; তখন আব্দুর রহিম ঘর থেকে বের হয়ে আসে। তারপর সারা প্রাঙ্গণ, ঘরের ভেতর, সার্ট-প্যান্টের পকেট, টেবিল আলমারির দেরাজ, সর্বত্র, সবখানে সকলে মিলে তারা খুঁজে দেখে; আব্দুর রহিম এবং পারভিনের সঙ্গে তাদের তরুণ ভৃত্য আকবরও আঁতিপাঁতি করে খোঁজে। তারপর যখন বোঝা যায় যে, ঘড়িটা বাড়ির কোথাও নাই এবং যখন আব্দুর রহিম তার স্ত্রীকে এটা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করাতে পারে যে, ঘড়িটা সে অন্য কোথাও হারায় নাই, তখন যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তা হচ্ছে, এটা তাহলে গেল কোথায়? আব্দুর রহিম বলে, বাড়ির ভিতর থেইকা জিনিছ উইড়া গেছে নিহি; এবং তখন তাদের সন্দেহ পড়ে আকবর এবং কাজের মেয়ে বসনার মায়ের ওপর। বাসনার মা অভিযোগ শুনেই কেঁদে ফেলে, আমি নেই নাই, আমি যুদি নিকি নিয়া থাকি আল্লায় আমার বিচার করবো, কুষ্ঠ হয়া আমার আত খয়া পড়বো। কিন্তু পারভিন এসব কথায় ভোলে না, সে বলে, এইসব কতা হুনায়ো না, আর কেউ বাড়ির ভিতরে আহে নাইকা, তুমি লইছ, না হয় আকবইরা লইছে, তুমরাই লইছ, তুমরাই বাইর করবা যুদি নিকি ভালা চাও। কিন্তু আকবর এসব কথায় একদম পাত্তা দেয় না, সে বলে, দুইশ/চাইরশ ট্যাকা দামের এইসব ঘড়ি আমি চুরি করি না, এবং তার এই কথায় আব্দুর রহিম চেতে আগুন হয়, সে চিৎকার করে, হারামযাদা শুয়ারের জানা রোয়াব দেখাচ, তুই চুরি করচ নাই তর বাপে চুরি করছে, এই ঘড়ি বাইর কইরা দিবি! মহল্লার লোকেরা যখন আব্দুর রহিম মিঞার ঘড়ি হারানোর

খবর শোনে তাদের মনে হয় যে, মহল্লায় কি চুরিদারি বেড়ে গেল, তারপর তাদের মনে হয় যে, হয়তো এটা আকবরেরই কাজ, হয়তো বাসনার মায়ের; তারা বলে, মাইর দিলেই বাপ বাপ কইরা বাইর কইরা দিবনে।

কিন্তু নয়াবাজারের কাঠের গোলা সারা রাত ধরে পোড়ার দুই দিন পর ভূতের গলির সব লোক মিলিটারি আসার ভয়ে মহল্লা ছেড়ে নদী পার হয়ে জিঞ্জিরা এবং নবাবগঞ্জের দিকে চলে যায়। আব্দুল হালিম তার মা এবং ছোট দুই বোনকে নিয়ে আরও একদিন মহল্লায় থাকে, কিন্তু তারপর তার মা, আমেনা, নীরব নিঝুম হয়ে আসা মহল্লায় আর থাকতে চায় না, বলে, খুব ডর লাগতাছে। তখন আব্দুল হালিম তার মা এবং দুই বোন রেনু আর বেনুকে জিঞ্জিরায় চরাইল গ্রামে তার ছোট খালার বাড়িতে নিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে যায় তাদের গলির একদম শেষ মাথার ৩৪ নম্বর বাড়ির আবু হায়দারের পরিবার । আবু হায়দারের স্ত্রী আগের দিন আব্দুল হালিমদের বাসায় আসে, তার সঙ্গে আসে তাদের বড় মেয়ে, ক্লাশ টেনের ছাত্রী ঝর্ণা; আব্দুল হালিম তাদের বাসার বাইরের বারান্দায় চেয়ারে বসে থেকে দেখে মায়ের সঙ্গে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের পাটকেল রঙের মলিন কামিজ পরা মেয়েটি বিকেলের ঘনিয়ে আসা ছায়ার ভিতর তাদের কামিনি গাছ তলা দিয়ে কেমন কেঁপে কেঁপে হেঁটে আসে। তখন আব্দুল হালিম ছায়ায় জড়ান ঝর্ণার ভীত মুখ এবং চোখের দিকে তাকায়, এবং তার মনে হয় যে, মহল্লার এই মেয়েটিকে সে কি আগে কখন দেখে নাই! বাসার ভিতরে ঢুকে ঝর্ণার মা যখন আমেনাকে বলে, হুনলাম আফা আপনেরাও যাইতাছেন গা, আমিতো ডরে বাঁচি না, আমরা যে কই যাই, তখন আব্দুল হালিম বলে, আপনেরা আমাগো লগে চলেন, কুনো অসুবিদা অইবো না, আমাগো খালার বাইতে অনেক জায়গা আছে থাকনের কুনো ঝামেলা অইবো না, আপনেরা হগ্গলে আমাগো লগে চলেন। ভূতের গলির লোকেরা পরে বলে যে, আসলে কামিনি গাছ তলায় ঝর্ণার বিপর্যস্ত চেহারা দেখার পরেই আব্দুল হালিমের মনে হয়েছিল, সে জানে সে ঝর্ণাদেরকে তাদের সঙ্গে জিঞ্জিরা যেতে বলবে, এবং তার ফলেই হয়তো পরিণতিতে আবু হায়দারের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে; অথবা হয়তো তা নয়, কারণ, এটা ছিল এমন এক সময় যখন কেউ জানতো না কার কখন কোথায় কি হবে।

তারপর মহল্লার লোকেরা যখন শোনে যে, আব্দুর রহিমের হারানো হাতঘড়ি আর পাওয়া যায় নাই, বাসনার মাকে ছোটখাটো চড়থাপ্পড় লাগানো এবং আকবরকে চাকুরিচ্যুত করার গুরুতর হুমকি দেয়ার পরেও তাদের কাছ থেকে ঘড়ি বের করা যায় নাই, তারা খুব হতাশ হয়; কারণ, তাদের মনে হয় যে, এরাই কেউ ঘড়িটা চুরি করেছে। তারপর, তখন, তারা মহল্লায় চুরি বেড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে পুনরায় বিচলিত বোধ করে এবং তারপর যখন এর কোন সমাধান বের করতে

পারে না তখন তারা তাদের পুরানো কথায় ফিরে যায়, তারা বলে যে, আব্দুর রহিম যদি সত্য কথা বলে থাকে, কল তলায় হাতমুখ ধোয়ার সময় সে যদি সত্যি ঘড়ি খুলে দেয়ালের ওপর রেখে থাকে তাহলে এই ঘড়ি অবশ্যই বাসনার মা নিয়েছে, অথবা নিয়েছে আকবর। তারা বলে, ভালা কইরা একটা মাইর দিলেই বাইরইবো; কিন্তু মহল্লার লোকের এসব কথায় তেমন কোন কাজ হয় না, পারভিন সুলতানা বাসনার মাকে পুনরায় ডাল ঘুঁটনি দিয়ে একদিন মারে। মার খেয়ে বাসনার মা পুনরায় হাউমাউ করে, আল্লাহকে সাক্ষী মানে, বলে, যুদি আমি নিয়া থাকি তাইলে আমি মুখে রক্ত উইঠা মরুম, আমার আতে কুষ্ট অইবো, আর যুদি না নিয়া থাকি তাইলে, আপনে আমারে মারছেন, আপনের প্যাডে কুত্তার ছাও অইবো, আপনের আত লুলা হয়া যাইব, আল্লায় আপনের বিচার করব, আমি আল্লার কাছে বিচার দিছি! এই হুমকিতে আব্দুর রহিমের স্ত্রী হয়তো ভয় পায়, মহল্লার লোকেরা এইসব ঘটনার কথা শোনে কিন্তু তারা আর আব্দুর রহিমের এই পারিবারিক সমস্যায় জড়াতে চায় না। পরে মহল্লার লোকেরা বলে যে, তারা আসলে বোকা ছিল, তাদের এই বোকামির কারণ, তারা মহল্লায় বহুদিন বানর দেখে নাই, এবং বানরের কথা ভুলে যাওয়ার ফলে তাদের জীবনে এই বিভ্রান্তি আসে।

মহল্লার লোকদের এই বিভ্রান্তি সারা জীবন থেকে যায়, তারা জানতে পারে না জিঞ্জিরায় ঝর্ণার আসলে কি হয়েছিল। এপ্রিল মাসের প্রথম শুক্রবার জিঞ্জিরায় মিলিটারি অপারেশনের মধ্যে ভূতের গলির যারা পড়েছিল তারাই এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশি অনিশ্চিত ছিল, কারণ, তারা সবকিছু সামনে থেকে দেখেছিল এবং জেনেছিল যে, যে কারো যে কোন কিছু ঘটতে পারতো, বন্দুক বাগিয়ে ধরা পাকিস্তানি মিলিটারিদের চক্রব্যূহের ভেতর আটকা পড়া কোন মানুষ গুলি কিংবা সঙ্গিনের খোঁচা খেয়ে মরতে পারতো, সেই মানুষ নারী হলে সে ধর্ষিত হতে পারতো, ধর্ষণের পর সে নিহতও হতে পারতো। ঝর্ণার কি হয়েছিল বা হয় নাই মহল্লার লোকেরা জানতে পারে নাই, আবু হায়দার এবং তার পরিবারের কেউ এ নিয়ে কথা বলে নাই, হয়তো আব্দুল হালিম বিশদ জানতো, কিন্তু সেও কিছু বলে নাই, এবং তরপর সে মরেও যায়। হয়তো চরাইল গ্রামে কোথাও মিলিটারির তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে ঝর্ণা অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল, হয়তো তখন আব্দুল হালিম তার সঙ্গে ছিল এবং তখন কোন বাড়ির আঙিনায় অথবা কোনো মাঠের মধ্যে তারা দুই জন দেখেছিল তাদের সামনে মিলিটারি; এবং তখন, মহল্লার লোকেরা ভেবে পায় না, আব্দুল হালিম কি করে বাঁচলো! ভূতের গলির লোকদের মনে হয় যে, হয়তো ঝর্ণা সব বুঝতে পেরেছিল, হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে, তার বাঁচার কোন উপায় নাই , তখন কোন ছলে সে আব্দুল

হালিমকে বাঁচায়; হয়তো আব্দুল হালিম গুলি খাওয়ার ভান করে মাটিতে মটকা মেরে পড়ে থাকে এবং ঝর্ণা তাকে জড়িয়ে ধরে মিছামিছি কাঁদে, এবং তখন তাদের চারদিক থেকে একটি বৃত্ত রচনা করে মিলিটারিরা এগিয়ে আসে। তারপর মিলিটারিরা কি করে? মহল্লার লোকদের জানা হয় না, তবে তারা জানে যে, ঝর্ণাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলে কিন্তু আব্দুল হালিম বেঁচে যায়। তখন হয়তো আব্দুল হালিম চরাইল গ্রামের কোন এক মাঠের ভেতর মৃত বালিকার পাশে শুয়ে নীরবে কাঁদে, তারপর সেদিন দুপুরের পর যখন মিলিটারি অপারেশন শেষ করে নদী পার হয়ে ঢাকা ফিরে যায় তখন সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর আব্দুল হালিম এবং ঝর্ণার পরিবারের লোকেরা দেখে যে, তারা দুই জন নিখোঁজ। তাদের খোঁজে আব্দুল হালিমের খালাতো ভাইয়েরা এবং আবু হায়দার বের হয় এবং অনেক খোঁজার পর তাদেরকে মাঠের মধ্যে পায়; তখন হয়তো আব্দুল হালিম ঝর্ণার রক্তাক্ত দেহ নিজের কোলের ভেতর নিয়ে বসে ছিল, হয়তো সে ঝর্ণার দেহের পাশে ভয় এবং শোকের প্রবল তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে ছিল। হয়তো আব্দুল হালিমই একমাত্র ঝর্ণার কি হয়েছিল তার সাক্ষী ছিল; কিন্তু সে মহল্লার লোকদের কিছু বলে না, আবু হায়দারও চুপ করে থাকে। জিঞ্জিরায় মিলিটারি অপারেশনের পরদিন আবু হায়দার পরিবার নিয়ে মহল্লায় ফিরে আসে এবং দেখে যে, আরও অনেকে তার আগেই মহল্লায় ফিরেছে। তখন মহল্লার যারা আবু হায়দারকে দেখে তারা পরে বলে যে, তারা দুই দিনের ব্যবধানে যেন আবু হায়দারকে চিনতে পারে না, তার চেহারা নয়াবাজারের ভস্মীভূত কাঠের গোলার ভাপ ওঠা গরম ছাইয়ের মত কালো এবং আগ্নেয় লাগে; তারা বলে, হায়দর মিঞা কি অইচে আপনের? তখন মহল্লার এই লোকদের দিকে তাকিয়ে সে শুধু বলে, মাইয়াটারে রাইখা আইলাম জিঞ্জিরায়। মহল্লার লোকেরা মনে হয় যেন তার কথা তবু বুঝতে পারে না, তখন আবু হায়দার আবার বলে, ঝর্ণারে জিঞ্জিরার কব্বরে রাইখা আইলাম!

তবে ভূতের গলির লোকদের কাছে এক সময় সব কিছু পরিষ্কার হয়ে আসে, এবং তারা বলে যে, তারা কেন যে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নাই! আব্দুর রহিম মিঞার হারানো ঘড়ি যখন আর সত্যি পাওয়া যায় না এবং মহল্লার লোকেরা যখন ছিঁচকে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে তখন আলি রেজা ব্যাপারির মেজ ছেলে মেজর মুজিবর রহমানের স্ত্রী, রহিমা বেগম রিতা, তার দুই ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকা বেড়াতে আসে। তখন একদিন রান্না ঘরে বাচ্চাদের জন্য হরলিক্স তৈরি করার পর কাজের মেয়ে টেবিলের ওপর বয়ামটা রেখে আসে তারপর ফিরে গিয়ে দেখে কাচের বয়ামটা নাই; কিশোরী মেয়েটা অবাক হয়, সে বলে, আরে বোতলটা গেল কই, এবং সে

রান্না ঘরে খোঁজে, ঘরের ভেতরে গিয়ে খোঁজে, ভাবে, হয়তো ভুল করে হাতে করে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও রেখেছে; কিন্তু কোথাও হরলিক্সের ভরা বয়ামটা পাওয়া যায় না; তারপর তারা পরিবারের সকলে মিলে খোঁজে, কোথাও নাই বয়াম! মহল্লার লোকেরা বলে যে, তারা আসলে বুদ্ধু ছিল, তারা মহল্লায় বানরের আগমনের কথা বুঝতে দেরি করে ফেলে, কারণ, তারা এজন্য তৈরি ছিল না; তখন তারা জানতে পারে যে, আলি রেজা ব্যাপারির বাড়িতে খোঁজাখুঁজির পর যখন হরলিক্সের বোতল পাওয়া যায় না তখন আলি রেজার বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রী জরিনা বলে, বান্দরে নেয় নাইতো? জরিনা খাতুনের কথা শুনে তার বাড়ির লোকেরা অবাক হয়, তারা বলে যে, বান্দর কোথায়, বান্দর কেমন করে কাচের এত বড় বয়াম নিয়ে যাবে! কিন্তু ভূতের গলির লোকেরা যখন এই কথা শোনে, তাদের ভেতর যারা প্রবীণ অথবা বৃদ্ধ তারা বলে যে, তাদের কেন ব্যাপারটা আগে মনে হয় নাই তা তারা বুঝতে পারে না, কারণ, ঘরের ভেতর থেকে হরলিক্সের বোতল বানরেরাই নেয়; এই বানরটা হয়তো তক্কেতক্কে ছিল, সুযোগ পাওয়া মাত্র ঘরে ঢুকে বয়ামটা বগলদাবা করে নিয়ে গেছে। তখন মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে যে, ভূতের গলিতে বহুদিন পর হয়তো বানর আবার ফিরে এসেছে এবং তারা মহল্লায় গোপনে আগমনকারী এই বানরদের দেখা পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করে, তারা বলে, বান্দর কি হাচাই আইছে, হালাগো দেখি না ক্যালা? তারপর মহল্লার লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সহসা বানরের দেখা পাওয়া যায় না। তখন একদিন রুনুর ভাতের হাঁড়ির খোঁজ পাওয়া যায়, চন্দ্রকান্তের ছোটভাই চন্দ্রশিব একদিন লাটাই এবং লাল ও সবুজ রঙের একটা ঘুড়ি নিয়ে তাদের বাড়ির ছাতে ওঠে ওড়ানোর জন্য, তখন সে পাশের বাড়ির ছাতের ওপর এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটা পড়ে থাকতে দেখে; তারপর ভূতের গলির লোকেরা মহল্লায় বানরের উপস্থিতির বিষয়ে নিশ্চিত হয়, তারা বোঝে এবার বানরের দেখা পাওয়া যাবে।

মহল্লার লোকেরা তখন আব্দুল হালিমকে দেখতে পায়; জোড়পুল লেনের বিহারিদের দ্বারা হিন্দুদের ফেলে যাওয়া খালি বাড়ি তালা ভেঙে লুঠ করার খবর পাওয়ার পর, বাসা লুঠ হওয়ার ভয়ে আব্দুল হালিম তার মা এবং দুই বোনকে জিঞ্জিরায় রেখে মহল্লায় ফিরে আসে। সে যেদিন ফিরে আসে সেদিন অথবা পরদিন রাতে তাদের দরজায় সে ঠকঠক করে আঘাতের শব্দ শোনে, তার প্রথমে ভয় লাগে, সে সাড়া না দিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে। তখন দরজার বাইরে থেকে আবু হায়দার তাকে ডাকে, আব্দুল হালিম আমি ঝর্ণার বাপ, এবং তখন আব্দুল হালিম দরজা খুলে বের হয়। আবু হায়দার সে রাতে আব্দুল হালিমকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়, সে তাকে বলে যে, এ সময় রাতের বেলা বাসায় এরকম একা থাকা নিরাপদ নয়; এবং মহল্লার লোকেরা বলে যে, প্রথম রাতেই সে

আবু হায়দারের বাসায় চুরি করে! মহল্লার লোকেরা বলে যে, এই ঘটনার কথা হয়তো কেউ জানতে পারতো না, কিন্তু তারা বলে যে, ঘটনা জানার জন্যই ঘটে, যেভাবেই হোক তা জানাজানি হয়ে যায়, কারণ, জানা না গেলে কোন ঘটনা আর ঘটনাই থাকে না। সে জনাই দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর, কত বছর পর মহল্লার লোকেরা বলতে পারে না, তখন কোন একদিন গলির আবর্জনা বয়ে নিয়ে বড় রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলার জন্য নিয়োজিত ঝাড়ুদারনি নিমফল দাসী আব্দুল হালিমদের বাসার সামনে দেয়ালের পাশে ফেলা জঞ্জাল পরিষ্কার করতে থাকে, সে সময় সঙ্গে আসা তার ছোট বালিকা মেয়ে, জবাকুসুম দাসীকে আমেনা বেগম তাদের বাসার ভেতর ডেকে নিয়ে যায় এবং এভাবেই আব্দুল হালিমের চুরির বিষয়টি প্রকাশিত হয়।

বানরের আগমনের বিষয়ে ভূতের গলির লোকেরা নিশ্চিত হয়, কিন্তু তারা তাদের দেখা পায় না; তখন বানরের দেখা পাওয়ার জন্য মহল্লার লোকেরা ব্যাকুল হয়ে পড়ে।

যেদিন জবাকুসুমকে আমেনা বেগম তাদের বাড়ির ভেতর ডেকে নিয়ে যায়, সেদিন রাতে অথবা অন্য কখনো মহল্লার লোকেরা এই ঘটনার কথা জানতে পারে; জবাকুসুমকে নিমফল কাজের সময় প্রতিদিনই সঙ্গে করে নিয়ে আসে, সে কাজ করে আর জবাকুসুম তার পিছনে ঘুরঘুর করে, অথবা কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে হাতের নখ খায়। এরকমভাবেই সে সেদিন আব্দুল হালিমদের বাইরের গেটের কাছে হয়তো দাঁড়িয়ে ছিল, হয়তো, এ মাঈ এ মাঈ, বলে নিমফল দাসীকে বিরক্ত করছিল; তখন বৃদ্ধা আমেনা বেগম বের হয়ে এসে জবাকুসুমকে ভেতরে নিয়ে যায়। তারপর জবাকুসুম যখন পুনরায় রাস্তায় ফিরে আসে তখন তার মা দেখে যে, তার মেয়ের চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, পিছনে ঝুটি করা চুলে লাল সাটিনের একটি ফিতা ফুলের মত করে বাঁধা। মহল্লার লোকেরা বলে যে, সুদীর্ঘ সময় ধরে আমেনা বেগম এই চুলের ফিতাটা সংরক্ষণ করেছিল এবং এই ফিতাটা আসলে ছিল আবু হায়দার মিঞার মেয়ে ঝর্ণার, আব্দুল হালিম এটা চুরি করে এনে তার নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল!

মহল্লার লোকেরা যখন শোনে যে, নেপাল চন্দ্রের ভাড়াটের হারানো ভাতের হাঁড়ি ছাতের ওপর পাওয়া গেছে, তারা বুঝতে পারে, আব্দুর রহিমের খোয়া যাওয়া সিটিজেন হাত ঘড়িও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, এবং এই খবর শোনার জন্য তারা প্রতীক্ষা করে; তবে তার চাইতেও বেশি আগ্রহের সঙ্গে তারা অপেক্ষা করে মহল্লার বাড়িঘরের ছাতে, কোন কার্নিশ অথবা দেয়ালের ওপর বানর দেখার জন্য। তারা বুঝতে পারে না এই বানর ভাত খেয়ে যায়, খুলে রাখা ঘড়ি নিয়ে পালায়, হরলিক্সের বোতল লোপাট করে, কিন্তু দেখা দেয় না কেন। তারা বানর দেখতে পাওয়ার খবর শোনার জন্য অপেক্ষা করে, তারা জানে এ খবর তারা পাবেই।

নিমফল দাসীর মেয়ের চুলে আমেনা বেগম লাল ফিতা বেঁধে দিলে, মহল্লার লোকেরা এই খবর পায় এবং তারা বলে যে, এই ফিতা ঝর্ণারই, আবু হায়দারের বাসা থেকে আব্দুল হালিম চুরি করেছিল। জিঞ্জিরায় ঝর্ণার মৃত্যুর পর মহল্লায় ফিরে আব্দুল হালিমকে একদিন রাতে আবু হায়দার তাদের বাসায় ডেকে নিয়ে যায়, বলে, রাইতের বেলা আমাগো বাসায় আয়া থাক। কিন্তু আবু হায়দারের বাসায় আব্দুল হালিমকে থাকতে দেয়ার জন্য খাট কিংবা চৌকিতে জায়গা হয় না; বাইরের ঘরের একমাত্র চৌকিতে আবু হায়দারের ছোট দুই ছেলে শোয়, তখন আব্দুল হালিমের জন্য মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতা হয়, আব্দুল হালিম বলে, কুনো অসুবিদা নাই। তারপর মশারি টাঙানোর আয়োজন করা হয় এবং তখন হয়তো ইলেক্ট্রিক চলে যায় অথবা বাতি হয়তো মিলিটারির ভয়ে আগে থেকেই নেভানো ছিল; এই অন্ধকার অথবা আধোঅন্ধকারের ভেতর মশারি টাঙাতে গিয়ে দেখা যায় এক কোনার রশি নাই, তখন মশারি বাঁধার জন্য দড়ি অথবা দড়ি জাতীয় কিছু খোঁজা শুরু হয়। ঘরের ভেতর আবু হায়দার, তার ছেলেরা এবং আব্দুল হালিম খোঁজে, কিন্তু পছন্দ মত কিছু পায় না। তখন কোন একসময় আব্দুল হালিম কোন টেবিলের ওপর অথবা চৌকির তোশকের নিচে ঝর্ণার চুলের ফিতাটা পায়, সামান্য একটু নাড়াচাড়া করেই বুঝতে পারে এটা একটা চুলের ফিতা, এবং এই বাসায় এ ধরনের ফিতা পরার আর কেউ না থাকায় সে নিশ্চিত হয়, এটা ঝর্ণার, এবং ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, সে তখনই অথবা পরে রাতে অন্ধকারের ভেতর শুয়ে শুয়ে ঠিক করে, এটা সে নিয়ে যাবে। সে রাতে, তখন আবু হায়দার যখন বুঝতে পারে যে, আব্দুল হালিম কিছু একটা পেয়েছে, সে বলে, দেখি কি, দ্যাও দেখি; কিন্তু ঝর্ণার চুলের ফিতা দিয়ে মশারি বাঁধার ইচ্ছা হয়তো আব্দুল হালিমের হয় না, অথবা হয়তো যেহেতু সে ঠিক করে যে, সে সেটা চুরি করবে, সে তখন বলে, এইটা দিয়া অইবো না। সকালে নিজেদের বাসায় ফেরার সময় সে চুলের ফিতাটা লুকিয়ে নিয়ে আসে এবং কাগজে মুড়ে নিজের পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে অথবা চৌকির তোশকের তলায় রেখে দেয়। সে হয়তো ঝর্ণার এই ব্যক্তিগত জিনিসটা স্মৃতি হিসাবে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু সে নিজেই আর বেশি দিন বাঁচে নাই।

ভূতের গলির লোকেরা অনেকদিন থেকে ভাবে যে, মহল্লায় বানর আছে, কিন্তু তারা যখন তা দেখতে পায় না, তখন প্রতীক্ষার ভেতর তারা পুনরায় বিভ্রান্ত হতে থাকে, তাহলে কি আসলে বানর নয়, অন্য কিছু, অন্য কেউ? কিন্তু তাদের এই বিভ্রান্তি এবং আপেক্ষার কাল এবার দ্রুতই শেষ হয় এবং তারা বানর দেখতে পাওয়ার খবর পায়।

আব্দুল হালিমের কথা যখন ভূতের গলির লোকেরা শোনে তখন তাদের মন বিষণ্নতায় ভরে যায়, কারণ, মহল্লায় এখন যারা প্রবীণ তারা বলে যে, সে সময় তাদের বয়স কম ছিল, এবং তখন জিঞ্জিরা থেকে ফিরে আসার পর তারা মহল্লার ভেতর ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে বাস করছিল। আব্দুল হালিম কয়েকদিন পর জিঞ্জিরা গিয়ে তার মা এবং ছোট দুই বোনকে ভূতের গলিতে নিয়ে আসে এবং তখন কিছুদিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মহল্লায় শোনা যেতে থাকে। ভূতের গলির লোকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের নানা রকম কীর্তির কথা শোনে এবং তখন আব্দুল হালিমের সঙ্গে দেখা হলে তারা ভাবে যে, আব্দুল হালিম হয়তো মুক্তিযুদ্ধে যাবে, হয়তো তারা তাকে বলে, কি মিঞা যুদ্দে যাইবা নিহি, খালি বাঁশের লাডি লয়া লেপ্ট রাইট করলা! কিন্তু আব্দুল হালিমের যুদ্ধে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তবে, তারপর অবশেষে একদিন আষাঢ় মাসের কোন এক রাতে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সে বাসা ছেড়ে যায়; এবং মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, আব্দুল হালিমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সে নিখোঁজ হয়েছে, তার মায়ের জন্য রেখে গেছে ছোট একটা চিরকুট। ভূতের গলির লোকেরা এই খবর যখন পায় এবং তারপর তারা যখন গোপনে রাতের বেলা বিবিসি এবং স্বাধীন বাংলা বেতারে যুদ্ধের খবর শোনে, তাদের মনে হয় যে, হয়তো আব্দুল হালিম কোথাও কোন সেক্টরে কোন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। তখন একদিন তারা তার মৃত্যুর খবর শোনে, এবং তারা বলে, আহারে আব্দুল হালিম! মায়ের জন্য টেবিলের ওপর চিরকুট রেখে যাওয়ার মাস দুয়েক পর ভাদ্র মাসের ১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় এক অপরিচিত যুবক আসে মহল্লায়, সে দ্রুত হেঁটে গিয়ে আব্দুল হালিমদের বাসার সম্মুখ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে তারপর আমেনা বেগমের সঙ্গে কথা বলে পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যায়; এই যুবক আব্দুল হালিমের মৃত্যুর খবর নিয়ে আসে। মহল্লার লোকেরা জানতে পরে যে, আব্দুল হালিম আষাঢ় মাসের ২৩ তারিখ বুধবার দিন শেষ রাতে বাসা থেকে বের হয়ে অলিগলির ভেতর দিয়ে হাজারিবাগে একটা বাসায় যায়, সেখান থেকে তারা মোট চারজন, যাদের ভেতর এই সংবাদ বাহক যুবকও ছিল, কামরাঙ্গির চরের ভেতর দিয়ে বুড়িগঙ্গার কূলে গিয়ে পৌছায়। নদীর কিনারায় তখন একটা মাঝারি আকারের ছৈ তোলা পানসি নৌকা বাঁধা ছিল, নৌকায় নিকষ অন্ধকারের ভিতর আরো অনেক লোক আব্দুল হালিমদের এই দলের জন্য অপেক্ষা করে বসে ছিল। সেদিন, আগন্তুক এই যুবক আব্দুল হালিমের মায়ের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলে যে, তারা যখন এই নৌকায় উঠছিল আব্দুল হালিম পা পিছলে নিচে পানিতে পড়ে যায়। তখন প্রবল বর্ষণ, হাওয়ার ঝাপটা আর ঢেউয়ের ঘূর্ণি ছিল, এবং আব্দুল হালিম সাঁতারও জানতো না, সে সেই অন্ধকারের ভেতর নদী বক্ষে হারিয়ে যায়; এবং অন্যদের

পক্ষে তখন তাকে খোঁজার জন্য বেশি অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, সেদিন তারা আব্দুল হালিমের মার কান্নার কোন শব্দ পেয়েছিল কিনা তা তাদের মনে নাই।

তারপর খুব শীঘ্রই মহল্লার লোকেরা বানরের সাক্ষাৎ পায়। প্রথম দিন হাজি আব্দুর রাজ্জাকের লেবেঞ্চুশের কারখানার শ্রমিকেরা পিছনের আঙিনায় দুটো বানরকে বড় কড়াইয়ে রাখা পানি খেতে দেখে এবং মহল্লার লোকেরা এই খবর জানতে পারে। এরপর ক্রমাগত এই বানরদের দেখা যেতে থাকে। কিছুদিন পর মহল্লার লোকেরা নিশ্চিত হয় যে, ভূতের গলিতে তারা বিভিন্ন জায়গায়, ছাতে, দেয়ালের ওপর অথবা কোন কার্নিশে যে দুটি বানরকে দেখে, সেগুলো আসলে একই বানর, এবং তারা আরো নিশ্চিত হয় যে, বানর দুটির একটা, যেটা আকারে বড়, সেটা মর্দা বানর, অন্যটা মাদি । তখন ভূতের গলিতে বান্দর নিয়ে সব ঘটনা ঘটতে থাকে, এবং মহল্লার লোকেরা বিহারির দোকানে বসে আলুপুরি এবং চা খায় আর বানরের গল্প করে। তখন একদিন এরশাদ সাহেবের বাসায় রাতে ডাকাত পড়ে, ডাকাতেরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে সোনাদানা টাকাপয়সা সব নিয়ে যায়, যাওয়ার সময় এরশাদ সাহেবের স্ত্রী চিৎকার করলে তার পেটে চাকু বসিয়ে দিয়ে, রাস্তার ওপর হাত বোমা ফাটিয়ে মাইক্রো বাসে করে চলে যায়। পরদিন পুলিশ এসে তদন্ত করে সব বিবরণ টুকে নিয়ে যায়; ভূতের গলির লোকেরা মহল্লায় ডাকাতির কথা শোনে, বিচলিত হয়, এবং তারা বলে, এই বান্দর দুইটা থাকে কই, গাছে, না কুনো বাড়ির ছাদে? তাদের কাছে এই বিষয়টিও অনেক দিন ধরে রহস্য হয়ে থাকে; বানর দুটো, একটার পিছনে অন্যটা, দেয়ালের ওপর দিয়ে হেলেদুলে হেঁটে যায়, কোন এক বাড়ির ছাতের ওপর থেকে অন্য বাড়ির ছাতের ওপর লাফিয়ে পড়ে অথবা দুপুর বেলা কোন কার্নিশের ওপর লেজ ঝুলিয়ে শুয়ে থাকে। মহল্লার নারী পুরুষ, শিশু কিশোর এবং বৃদ্ধ, সকলে, যখন যার হাতে সময় থাকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বানর দেখে, বানরের সব কিছুই তাদের কাছে খেলা মনে হয়; কিন্তু তারা এই বানরদের আস্তানার হদিস জানতে পারে না।

আব্দুল হালিম তার মার জন্য চিরকুট লিখে চলে যাওয়ার পর একদিন আমেনা বেগম সাটিনের লাল চুলের ফিতাটির সন্ধান পায়। কোন একদিন ঘর গোছাতে গিয়ে আব্দুল হালিমের টেবিলের ড্রয়ারে অথবা বিছানার তোশকের নিচে সে কাগজে জড়ানো ফিতাটা দেখে প্রথমে ভাবে এটা রেনু কিংবা বেনুর কিনা; তার এই বিষয়টি ভেবে হয়তো অবাক লাগে যে, তার মেয়েদের চুলের ফিতা এমন পরিপাটি করে ভাঁজ করে কে কাগজে মুড়ে রেখেছে; তবে তার এরকম সন্দেহ হয় যে, ফিতাটা আসলে হয়তো রেনু/বেনুর নয়, অন্য কারো। তখন আমেনা বেগম ফিতাটা নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখে বিষয়টা নিশ্চিত হয়,

কারণ, এই সাটিনের ফিতা থেকে কদুর তেলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, এবং এক মুহূর্তে সে বুঝতে পারে যে, এটা ঝর্ণার; ঝর্ণা হয়তো সুগন্ধি তেল দিত মাথায়। মহল্লার লোকেরা বলে, জবাকুসুমদাসীকে আব্দুল হালিমের মা ফিতাটা দিয়ে দেয়ার পরই কেবল তারা এই ফিতার কথা শোনে এবং জানতে পারে যে, আব্দুল হালিম এটা চুরি করেছিল। তারা বলে যে, এই ফিতার দিকে তাকিয়ে আমেনা বেগমের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়, হয়তো মৃত বালিকা ঝর্ণার জন্য, হয়তো তার পাগল ছেলের জন্য। তারপর, সেদিন সে ফিতাটা একই কাগজে জড়ানো অবস্থায় তার বেতের ব্যক্তিগত তোরঙ্গের ভেতর সংরক্ষণ করে রেখে দেয় এই আশায় যে, একদিন আব্দুল হালিম যখন মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরবে তখন সে বুঝতে পারার আগেই আমেনা বেগম ফিতাটা ঠিক আগের জায়গায় রেখে দেবে; এবং তখন আব্দুল হালিমের যখন ফিতাটার কথা মনে পড়বে সে বিছানার তোশক উল্টে দেখতে পাবে যে, আরে আশ্চর্য, ফিতাটা একই অবস্থায় রয়ে গেছে এবং তখন হয়তো তার ঝর্ণার কথা মনে হবে এবং চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসবে। মৃত ঝর্ণার কথা ভেবে ছেলের চোখে পানি দেখা দেয়ার সম্ভাবনায় তখন আমেনা বেগমের চোখ আর্দ্র হয়ে ওঠে; সে তোরঙ্গের ভেতর ফিতাটা রেখে দিয়ে দিন গনে।

ভূতের গলিতে বানরের গল্প শোনা যায়, মহল্লার লোকেরা বলে, হালা বান্দরের কথা হুনচোস, হালারা বহুত বিটলা কইলাম; এবং তারা এই গল্পের ভেতর নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তখন একদিন আব্দুর রহিমের হারানো হাতঘড়িটা পাওয়া যায় এবং আব্দুর রহিম মিঞার প্লাস্টিকের কারখার কর্মচারি এবং একই সঙ্গে তার গৃহভৃত্য আকবর বানরের আস্তানা খুঁজে বের করে। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, আসলামদের চালতা গাছে একদিন আসলাম চালতা পাড়তে উঠলে গাছের কোটরের ভেতর ঘড়িটা পায় পিটিয়ে ভাঙা অবস্থায়, এবং সে দেখেই বুঝতে পারে যে, এটা আব্দুর রহিমের খোয়া যাওয়া ঘড়ি। তখন আসলাম ভাঙা ঘড়িটা আব্দুর রহিমের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসে; পরে দুপুর বেলা ভাত খেতে এসে আব্দুর রহিম এবং আকবর ঘড়িটা দেখে, পারভিন দেখায়, বলে, বান্দরে লয়া গেছিল গা, কেমুন পিটায়া ভাঙচে! তখন পারভিনের কথা শুনে আকবর রাগে ফেটে পড়ে, বলে, আপনেগো ঘড়ি ইন্দুরে লয়া যায় বান্দরে লয়া যায়, আপনেগো কুনো তাল নাইকা, আর আপনেরা আমাগো চোর বানান, গাইল পাড়েন! তখন এক কথায় দুই কথায় কথা বাড়তে থাকে এবং এক সময় আব্দুর রহিম রেগে গিয়ে পায়ের স্যান্ডেল খুলে আকবরকে পেটায়; স্যান্ডেলের বাড়ি খেয়ে আকবর আরো ক্ষেপে যায়, এবং সে লাঠি নিয়ে বানরের খোঁজে বের হয়। তারপর যখন সে ফখরুলদের বাড়ির দোতলার সিঁড়ি ঘরের ছাতের ওপর বানর দুটোকে পায়, তার মনে হয় যে, এটাই এদের স্থায়ী থাকার জায়গা; কিন্তু পরিণতিতে

সেদিন এই বানরেরা আকবরের পশ্চাৎদেশে কামড়ে দেয়! সেদিন প্রথমে মহল্লার বাড়িঘরের ছাতের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আকবর বানর খোঁজে, তারপর বিকাল বেলা এখলাসউদ্দিনের চারতলা বাড়ির ছাতে উঠে যখন দূরে তাকায় সে ফখরুলদের সিঁড়ি ঘরের ওপরে পানির ট্যাঙ্কের তলায় বানর দুটোকে শুয়ে থাকতে দেখে। এই জায়গার চারপাশে টিনের কৌটা, কাচের শিশি বোতল, দলা পাঁকানো কোঁচকানো কাপড়ের টুকরা পড়ে থাকতে দেখা যায়; এসব দেখে আকবর বুঝতে পারে, এটাই বান্দরের বাসা এবং তখন সে এমন কাজ করে যে, বানর তাকে কামড়ে দেয়। মহল্লার লোকেরা জানতে পারে যে, আকবর দূর থেকে বানরের আস্তানার স্থান নির্ণয় করার পর ফখরুলদের বাসায় যায় এবং বাসার লোকদের কিছু না বলে দোতলার ছাতে ওঠে, সেখান থেকে সে লাঠিটা মুখে কামড়ে ধরে পানির পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে। তখন পানির লোহার পাইপ বেয়ে ওঠার সময় হয়তো শব্দ হয়েছিল, ফলে বানরেরা তৈরি ছিল, আকবরের মাথা সিঁড়ি ঘরের ছাতের ওপর থেকে দেখা যাওয়া মাত্র বানর দুটো দাঁত খিঁচিয়ে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। আকবর তার লাঠি ব্যবহার করার কোন সুযোগই পায় না, বানরের হামলার মুখে সে হাত ছেড়ে দিয়ে দোতলার ছাতের ওপর পড়ে যায়, তার মুখের লাঠি কোন দিকে যায় তার ঠিক থাকে না। কিন্তু বানরেরা তবু তাকে ছাড়ে না, লাফিয়ে নেমে তেড়ে আসে, আকবর মরিয়া হয়ে তখন সিঁড়ির দরজার দিকে দৌড় দেয়, এবং সে যখন দরজা পেরিয়ে প্রায় ভেতরে চলে যাচ্ছিল তখন পুরুষ বানরটা এসে পেছন থেকে তার কোমরের নিচে প্যান্টের ওপর কামড় বসায়; তবে সুতি মোটা কাপড়ের প্যান্ট হওয়ায় সে বেঁচে যায়, দাঁত তার গায়ে ফোটে না। কিন্তু মহল্লার লোকেরা যখন এই খবর পায়, তারা বিশ্বাস করতে পারে না যে, অত বড় একটা জানোয়ার ক্ষেপে গিয়ে কামড়ে দেয়ার পরও গায়ে দাঁত বসবে না; তারা তখন আকবরকে বিরক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বলে, হাচাই তর হোগার কুনো ক্ষতি হয় নাইকা, ভালা কইরা দেখ কামুড় লাগছে নিহি, বাসনার মায়েরে দিয়া দেখা! কিন্তু আকবর তাদের পাত্তা দিতে চায় না, সে বলে, আপনেগো এত খাওজানি অইতাছে ক্যালা; তারপর মহল্লার লোকদের সে বলে যে, তার কোন সমস্যা নাই। কিন্তু ভূতের গলির লোকেরা এত সহজে তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না, তারা বিহারির দোকানে বসে যখন আকবরকে দেখে তাকে চিৎকার করে ডাকে, অই আকবর, অই হালারপোত এদিকে আয়, এবং তারপর তাকে ভয় দেখায়। তারা বলে যে, কুকুর কামড়ালে যেমন মানুষের পেটে কুকুরের বাচ্চা হয় এবং মানুষ পাটের দড়ির মত মোচড় খেয়ে মুখে ফেনা তুলে মরে যায়, সে রকম হয় বানর কামড়ালেও; তারপর তারা বলে, তরে বান্দরে কামড়াইছে, নিজে নিজে মাদবরি না কইরা ডাক্তারের কাছে যা, যায়া হোগা দেখায়া সুঁই ল গা, না হইলে

তুই মরবি; কিন্তু আকবর মুখ ব্যাদান করে, তাদের কথা শোনে না। তখন আব্দুর রহিম বিষয়টা জানতে পারে এবং বিকাল বেলা সে তাকে জোড়পুল লেনে ওয়াজেদ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ওয়াজেদ ডাক্তার জিজ্ঞাসাবাদ করে সবকিছু জেনে নেয়, তবু তার মনে হয় যে, ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একবার দেখা প্রয়োজন; এবং তখন আব্দুর রহিমকে চেম্বার থেকে বের করে দিয়ে সে যখন বলে, একটু দেখা দরকার, তখন আকবর প্যান্ট খুলে নিচে নামিয়ে তার পশ্চাৎদেশ ওয়াজেদ ডাক্তারের স্পট লাইটের আলোর সামনে উঁচু করে ধরে। ওয়াজেদ ডাক্তার ভাল করে দেখে আকবরের ত্বকে বানরের দাঁতের কামড়ের কোন ক্ষত হয়েছে কিনা, তারপর মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে, কিছু হয় নাই তোমার। তখন আকবরের সঙ্গে ভূতের গলির লোকদের দেখা হয়, তারা বলে, ডাক্তাররে হোগার কাপড় খুইলা দেখায়া আইলি!

আমেনা বেগম যেদিন তার ছেলের মৃত্যুর খবর পায়, তারপর কোন একদিন হয়তো বেতের তোরঙ্গের ভেতর রাখা লাল ফিতাটার কথা তার মনে পড়ে, এবং ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, এই বস্ত্রখণ্ড তার ছেলের স্মৃতির তাবৎ স্মারকের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। এবং তারপর পুনরায় তোরঙ্গের ভেতর ফিতাটা দীর্ঘদিন পড়ে থাকে, রেনু এবং বেনুর বিয়ে হয়ে যায়, তাদের বাচ্চা হয়, এই বাচ্চারা বড় হতে থাকে, এবং আমেনা বেগমের শরীর জীর্ণ মলিন হয়ে আসে। এই সময় হয়তো সুগন্ধি ফিতাটার কথা ভেবে সে বিচলিত হয়ে পড়ে এবং একদিন বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিমফল দাসীর মেয়েটিকে দেখে; এবং তারপর সেদিন মহল্লায় লাল চুলের ফিতার ইতিহাস প্রকাশিত হয়।

তখন বানরেরা একদিন অন্য এক কাণ্ড করে, তারা একটা আস্ত পিস্তল চুরি করে আনে; কেউ কেউ বানরদেরকে এই অস্ত্র নিয়ে খেলা করতে দেখে, এবং মহল্লার লোকেরা যখন এই খবর পায় তারা ভাবে যে, এটা হয়তো আসল না, খেলনা পিস্তল। তারপর তাদের মনে হয় যে, এটা হয়তো আসলই, তবে তারা বুঝতে পারে না এই অস্ত্রটা কার, এবং তারা বলে, অইবো কারু, কত মাইনষের কত রকমের পিস্তল আছে মহল্লায়। তারপর তারা ভাবে যে, পিস্তলওয়ালা নিশ্চয়ই তার এই অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা করবে এবং তারা তখন জানতে পারবে পিস্তলের মালিক কে; কিন্তু পিস্তল উদ্ধার করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না, অথবা হয়তো আসে এবং গোপনে সেটা উদ্ধার করে নিয়ে যায়, মহল্লার লোকেরা জানতে পারে না; মহল্লার লোকেরা শুধু জানতে পারে যে, দুই দিন ধরে দখলে রাখার পর বানরেরা অস্ত্রটা কোথাও ফেলে দেয়। তখন মহল্লার ছাতের ওপর দিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বানরদের ঘুরে বেড়ানোর খবর হয়তো সূত্রাপুর থানার পুলিশদের কানে যায়, কারণ, সহসা একদিন তারা মহল্লায় এসে হাজির হয় এবং মহল্লার

লোকদের পিস্তলের কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু মহল্লার যারা পুলিশের সাথে কথা বলে তারা ঝামেলায় জড়াতে চায় না, প্রথমে চুপ করে থাকে, তারপর বলে, পিস্তলের খবর আমরা কি জানি, আমরা কুনো পিস্তলউস্তল দেখি নাইকা ; এবং তখন তারা আকবরকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে দেখে। ভূতের গলির লোকদের আব্দুর রহিমের এই ভৃত্য, আকবরের প্রতি বানরের আস্তানা খুঁজে বের করার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ হয়, কিন্তু তাকে দেখলে তাদের পরিহাস করার ইচ্ছা জেগে ওঠে, তারা তার দিকে তাকিয়ে হাসে এবং বলে, কিরে আকবইরা, বান্দরের লগে পারছ না, হোগায় কামড়ায়া দিল! তখন এতদিন পর মনে হয় যেন আকবরের মন মেজাজ প্রসন্ন হয়ে আসে সে মহল্লার লোকদের কথায় চেতে না, বরং হাসে এবং বলে, খাড়ান না ক্যালা, দেখেন না, আপনেগো হোগায়ও কুন দিন আয়া কামড়ায়!

তখন ভূতের গলির লোকদের আব্দুল হালিমের কথা মনে পড়ে, তাদের মনে হয় যে, অনেক দিন তারা আমেনা বেগমকে ঠিকমত দেখে নাই। এই দীর্ঘ সময়ে আমেনা বেগমের জীবন হয়তো নিঃশেষ হয়ে আসে, হয়তো শীতের পূর্বেকার অশত্থের পাতার মত বিবর্ণ হয়ে ওঠে এবং ঝরে পড়ার প্রান্তে উপনীত হয়ে হিমেল হাওয়ায় ঝির ঝির করে কাঁপে।

মহল্লার লোকেরা কেউ কেউ কখনো বানর দেখার জন্য এখলাসউদ্দিনের বাসায় যায়, চার তলার ছাতে উঠে দূরে ফখরুলদের সিঁড়ি ঘরের ওপর বানর দুটোকে দাপাদাপি করতে দেখে; তাদের তখন খুব আমোদ হয়। এখলাসউদ্দিনের বড় ছেলের স্ত্রী মনোয়ারা, মেয়েটি ভাল, সুন্দর, গোলগাল এবং নরম স্বভাবের; সে স্বামীর সঙ্গে বাসার চার তলায় থাকে, কখনো তার স্বামী কোন কারণে অথবা কারণ ছাড়াই তাকে গালমন্দ করলে তার খুব মন খারাপ হয়, তখন সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ রকম একদিন মনোয়ারাকে তার স্বামী আব্দুল কুদ্দুস কোন কারণে অথবা অকারণেই বকাঝকা করে, মাগি, বলে গাল দেয়, তাতে মনোয়ারার খুব মন খারাপ লাগে এবং সে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; তখন সে ফখরুলদের সিঁড়ি ঘরের ছাতের ওপর বানর দুটোকে হুটোপুটি করতে দেখে। তার মনে হয় যে, প্রাণী দুটোর কোন ক্লান্তি নাই, তারা ক্রমাগত লাফায়, জড়াজড়ি করে, একজন আরেকজনকে কামড়ায়; তখন, তারপর, মনোয়ারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই একদম হঠাৎ, মেয়ে বানরটা ছাতের ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পুরুষটি পিছন থেকে উপগত হয়, মহল্লায় নেমে আসা বিকালের নরম আলোর ভেতর প্রবলভাবে কটি সঞ্চালন করে সঙ্গম করে। মনোয়ারা ভাবে যে, সরে যাওয়া উচিত, কিন্তু সে সরে না, দেখে আরো দূরে মহল্লায় সূর্য ডুবে যায়।

*২০০০*

# ইন্দুর-বিলাই খেলা

ভূতের গলিতে ইন্দুর-বিলাই খেলা হয়। আমরা প্রথমে খেলাটাকে জানি।

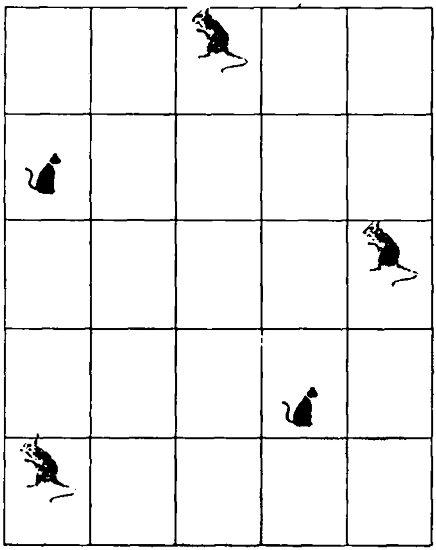

## ইন্দুর-বিলাই খেলা

সংজ্ঞাঃ

ইন্দুরঃ ইন্দুর হচ্ছে ইন্দুর জাতীয় প্রাণী (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)।
(বাক্য গঠনঃ ইন্দুর ভায়া পেয়েছে ভয়!)
বিলাইঃ বিলাই হচ্ছে বিলাই জাতীয় প্রাণী (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য)।
(বাক্য গঠনঃ বিলাই চড়ে জগৎময়।)
খেলাঃ খেলা মানে খেলা করা।
(বাক্য গঠনঃ বালকেরা খেলা করে, আগুন নিয়ে খেলা, ইত্যাদি।)

**খেলার প্রকার** (নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)ঃ

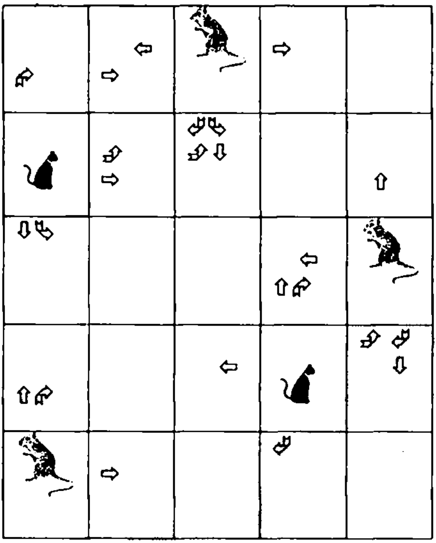

খেলা প্রথমত দুই প্রকার, যথাঃ দল বেঁধে খেলা এবং ওয়ান-টু-ওয়ান খেলা। (দল বেঁধে খেলার উদাহরণ, যথাঃ একদল বিলাই একটা ইন্দুর অথবা একদল ইন্দুরকে দৌড়ায়।

ওয়ান-টু-ওয়ান খেলার উদাহরণ, যথাঃ একটাই বিলাই একটাই ইন্দুরকে লৌড়ায়।)

আবার সাধারণত ওয়ান-টু-ওয়ান খেলা দুই প্রকার হতে পারে, যথাঃ সরল রৈখিক এবং চক্রাকার। উল্লেখ্য, চক্রাকার খেলার জন্য অন্তত তিনজন খেলোয়াড় লাগবে।

(সরল রৈখিক খেলার উদাহরণ, যথাঃ একটা বিলাই একটা ইন্দুরকে লৌড়াইতে থাকে। চক্রাকারের উদাহরণ, যথাঃ সাধারণত বালকদের খেলায় ক লৌড়ায় খ-কে, খ লৌড়ায় গ-কে , আবার গ লৌড়ায় ক-কে।)

খেলার পদ্ধতিঃ

কোন নির্দিষ্ট ছক নাই। সময় ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য, তবে বহিঃস্থ অথবা অন্তর্গত লৌড়ালৌড়ি অবশ্যই থাকবে।

ভূতের গলির খেলোয়াড়গণঃ

খেইলে ইন্দুর হয় কারা? আমরা হই; আলতাফ আলি, মোহাম্মদ সেলিম, মোছাঃ খতিজা বেগম, চন্দ্রকান্ত ও পূর্ণলক্ষ্মী বসাক, এবং আরো অনেকে হয়।

কারা বিলাই হয়? বাবুল মিঞা, হুমায়ুন কবির ওরফে হুমু, তার ভাই জাহাঙ্গির হোসেন ওরফে জাহু, আব্দুল জব্বার ওরফে কান কাটা জব্বার, আব্দুল গনি, মওলানা আব্দুল গফুর, শামসুল আলম খান এবং তার ছেলে ইব্রাহিম খান, আব্দুল হাকিম ওরফে হাক্কা, এরা হয়।

**খেলার কিছু নমুনাঃ**

**নমুনা ১ ঃ বালকেরা খেলা করে।**

ভূতের গলির ৩২ ও ৩৩ নম্বর বাড়ির বাড়িওয়ালিদের মধ্যে একটা চম্পা ফুল গাছ নিয়ে কাইজা ছিল, এবং আমরা যখন ৩২ নম্বর বাঘওয়ালা বাড়িতে ভাড়াইটা হয়ে আসি আমরা এই কলহের মধ্যে পড়ে যাই এবং তখন আমরা ৩৩ নম্বর বাড়ির ভাড়াইটাদের পোলাপানদের ভেতর মোহাম্মদ বাবুল মিঞাকে আবিষ্কার করি। সে ছিল মন্দিরের পাশের আমাদের উপগলির বালকদের সর্দার, এবং সে আমাদেরকে ইন্দুর-বিলাই খেলায় গ্রহণ করে, আমরা তাতে খুশি হই; তারপর সে যখন বলে যে, খেইলে ইন্দুর আর বিলাই লাগে, আমরা বিষয়টা ভেবে দেখি। আমাদের মনে হয় যে, এটা যদি একটা খেলা হয় তাহলে ইন্দুর লাগবে, আর ইন্দুর থাকলে বিলাইও থাকবে। আমরা তখন বাবুল মিঞাকে বলি, খেইলে ইন্দুর

বিলাইতো লাগবোই, নাইলে খেইলতো ইন্দুর-বিলাই খেইল হইব না! তবে আমাদের মনে হয় যে, আমরা এই খেলার কথা আগে কখন শুনি নাই; আমরা বুঝতে পারি না যে, ভূতের গলির অথবা আমাদের উপগলির বালকদের সর্দার, বাবুল, মহল্লায় নতুন পেয়ে আমাদের সঙ্গে মশকারি করে কিনা। আমাদের সন্দেহ যায় না , আমরা বলি, এইটা কেমুন খেইল; কিন্তু বাবুল মিঞা বলে, খারাপ কি, এই ইন্দুর ইন্দুর, ধর ধর, মার মার, লৌড়ালৌড়ি, ফালাফালি, মারামারি করলাম; তখন আমরা এই খেলায় রাজি হই। দেখা যায় যে, খেলায় সকলেই বিলাই হতে চায়, ইন্দুর পাওয়া যায় না, তখন আমাদের নতুন বন্ধু বাবুল মিঞা আমাদেরকে বলে যে, মহল্লায় যারা নতুন আসে তারা ইন্দুর হয়, আর পুরনোরা বিলাই, এটাই নিয়ম। তারা, অর্থাৎ বাবুল মিঞারা, যখন নতুন এসেছিল মহল্লায়, তখন তারা ইন্দুর হতো; এখন আমরা নতুন, এখন আমরা ইন্দুর হব। আমরা তার এই কথা মেনে নিতে চাই না, আমাদের সন্দেহ হয় যে, আমাদের ইন্দুর বানানোর জন্য এটা তার একটা ফন্দি, তবে আমরা বেশি তর্ক করি না, ইন্দুর হোক বান্দর হোক আমরা খেলা শুরু করতে চাই। ফলে বাবুল মিঞার চালাকি টিকে যায় এবং আমরা, ৩২ নম্বর বাঘওয়ালা বাড়ির নতুন ভাড়াইটা হয়ে আসা পোলাপান, আমাদেরকে বাবুল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ক্রমাগত ইন্দুর বানায়। আমরা বাবুল মিঞা এবং তার দলের সঙ্গে খ্রিষ্টানদের গোরস্তানের কাছে, বলধা গার্ডেনের কোনায় টিপুসুলতান রোডের মাঝখানে গোল চত্বরের ওপর জড়ো হই এবং আমাদের ভেতর থেকে একজনকে নির্বাচন করি, বলি, তুই ইন্দুর, এবং তখন সে রাস্তা পার হয়ে, খ্রিষ্টানদের গোরস্তানের দেয়াল টপকে লৌড়ায়; আমরা, অন্য বালকেরা, তার পিছনে ছুটি, চিৎকার করি, ইন্দুর ইন্দুর, ধর ধর, মার মার, গেল গেল গেল গেল! আমরা, মহল্লার নতুন পোলাপান পর্যায়ক্রমে সকলে ইন্দুর হই এবং বাবুল মিঞা ও তার দল আমাদের ধাওয়া করে ধরে, কিল ঘুষি মারে, মাটিতে ফেলে দেয়, আনন্দে ফেটে পড়ে বলেঃ

ধর চিকা মার চিকা
চিকার দাম পাঁচ সিকা

আমাদের নাকমুখ প্রায়ই ফাটে, সার্টের হাতা ছিঁড়ে যায়, শরীর ধুলামলিন হয়, কিন্তু আমাদের খারাপ লাগে না; ইন্দুর হতে পারায় উল্লাস হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এবং বিকালে স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত আসা পর্যন্ত আমরা ৩২ ও ৩৩ নম্বর বাড়ির ভাড়াইটাদের পোলাপান ইন্দুর-বিলাই খেলি এবং যখন আমাদের দুই বাসার দুই বাড়িওয়ালি কাইজা করে, আমরা সব কাজ আর খেলা ফেলে রেখে দেয়াল বেয়ে বান্দরের মত একতলা

দালানের ছাতে উঠে কাইজা করা দেখি। আমাদের দুই বাড়িওয়ালির একজন বুইড়া আর শুঁটকি, অন্যজন জোয়ান এবং মোটকি; তারা একটা ফুল গাছ নিয়ে কাইজা করে। ৩৩ নম্বর বাড়ির বাড়িওয়ালি পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কা কৃশকায় দিলুয়ারা বেগম দুই/পাঁচ কিংবা দশ বছর আগে কোথাও একটা চম্পা ফুল গাছের চারা পায় এবং সে তার বাড়ির ভেতরের প্রাঙ্গণে পাশের বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে চারাটা এনে লাগায়। এই গাছ এখন বড় হয়ে দেয়াল ছাড়িয়ে অনেক উঁচু এবং ঝাঁকড়া হয়ে ওঠায় ৩২ নম্বর বাঘওয়ালা বাড়িতে এর ছায়া পড়ে, ফলে এই বাড়ির বাড়িওয়ালি কম বয়স্কা পৃথুলা পারভিন সুলতানার সঙ্গে এই গাছ নিয়ে দিলুয়ারা বেগমের কাইজা বাঁধে। আমরা দুই বাড়ির পোলাপান ছাতের ওপর থেকে গলা বের করে এই কাইজা শুনি এবং এই বিষয়ে একমত হই যে, ৩২ নম্বর বাড়ির মালিক রহিম ব্যাপারির স্ত্রী পারভিন সুলতানার কোন কারণে যখন মন মেজাজ খারাপ থাকে এবং সেই সময় সে যখন বাড়ির পিছনের আঙ্গিণায় যায়, দেয়ালের ওপর দিয়ে চম্পা ফুল গাছটার ছড়িয়ে পড়া দেখে তার রাগ হয়। সে তখন হয়তো গাল দেয়, বাড়ির মইদ্দে আইন্না হোগার গাছ লাগাইছে, আল্লাদে বাঁচে না; এবং দেয়ালের অন্য পার থেকে পারভিনের কথা শুনে হয়তো দিলুয়ারা এগিয়ে আসে। তখন উঁচু দেয়ালের দুই পাশে দুই জন খাড়ায়, তারা কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না, তবু দেয়ালের মাথার দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে কাইজা করে।

- বাড়ির মইদ্দে আইন্না আন্ডার গাছ লাগাইচে, দিনের বেলা একটুও রইদ আহে না!
- গাছ বাড়ির মইদ্দে লাগামু নাতো কই লাগামু, রাস্তায় লয়া যায়া লাগামু!
- রাস্তায় লাগাইবেন ক্যালা, আইনাতো দেওয়ালের কইলজার বিতরে লাগাইছেন!
- আমার গাচ আমি মাইনষের কইলজার ভিতরে লাগাই নাইকা, আমার বাড়ির ভিতরেই লাগাইচি!
- ছেওয়াটাতো এই বাড়ির মইদ্দে আয়া পইড়া থাকে, শীত/গরম কুনোদিন ইকটু রইদও আহে না বাইতে।
- বাড়ি তুইলা লয়া অইন্যখানে যাও গা, বেটি, ছেওয়া পড়ব না।

বেটি বলায় পারভিনের সহ্য হয় না, সে ফেটে পড়ে।

- বেটি বেটি করেন ক্যালা, বদখাসলত বুড়ি!

তারপর বিরক্ত হয়ে দিলুয়ারা বেগম এবং পারভিন সুলতানার কাইজা রেখে আমরা পুনরায় ইন্দুর-বিলাই খেলতে যাই; বাবুল মিঞা আমাদের, অর্থাৎ ৩২ নম্বর বাড়ির পোলাপানদের, ইন্দুর বানিয়ে মারপিট করতে থাকে। আমরা আমাদের ক্রমাগত ইন্দুর হওয়ার কথা কাউকে বলি না, কিন্তু তারপরও মহল্লায় এ

কথা ফাঁস হয়ে যায় এবং আমাদের মার খাওয়ার কথা শুনে আমাদের বাপমায়ের মন খারাপ লাগে; আমরা তাদেরকে খেলার বিষয়টা বোঝাতে পারি না, বিলাইদের হাতে মার খেয়ে ধুলামাখা হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার পর তারা আমাদেরকে আবার পেটায়, আমাদেরকে গাধার বাচ্চা বলে গাল দেয়, বলে, খালি ইন্দুর হচ, বিলাই হয়া পারচ না! হয়তো চম্পা ফুল গাছ নিয়ে বিবাদের কারণে, পাশের বাড়ির ভাড়াইটার পোলা বাবুল মিঞা এবং তার দলের হাতে মার খাওয়ার বিষয়টা আমাদের বাড়িওয়ালি পারভিনেরও সহ্য হয় না, সে আমাদের মায়েদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাদের জন্য পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে; আমরা যখন আমাদের মায়েদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে, এটা খেলা-খেলা মার খাওয়া মাত্র, তখন আমাদের মোটকি বাড়িওয়ালি নাক কুঁচকে, তার মোটা সাদা চর্বি ঝুলে পড়া হাত নেড়ে বলে, খেইলের নামে খালি মাইর খাচ, মাগি নিহি তরা! তখন, কখন কখন ৩১ নম্বর বাড়ি থেকে আমাদের ইন্দুর-বিলাই খেলার সাথি আসলামের বিধবা নিঃসন্তান ফুপু, মোছাঃ খতিজা বেগম, আমাদের মায়েদের সঙ্গে গল্প করার জন্য এ বাড়িতে আসে এবং আমরা তাকে দেখি; তার মাথার চুল কাঁচাপাকা হয়ে গেছে, মুখ এবং গলার চামড়া একটু শিথিল হয়ে পড়েছে। আমাদের মায়েরা আড়ালে ফিসফিস করে বলে, নষ্ট মায়ালোক আছিল, এবং আমরা এই কথা শুনি; কিন্তু আমরা, ইন্দুর-বিলাই খেলার বিটলা পোলাপান, নষ্ট মেয়ে মানুষকে ভালবাসি, তার ফরসা প্রৌঢ় মুখের লাবণ্যে বিমোহিত হই। সে কখন কখন আমাদের মাথায় আঙুল বুলিয়ে আদর করে, আমরা তাকে আসলামের মত আহ্লাদ করে 'খতিজা ফুফু' বলে ডাকি। আমাদের মায়েরা আমাদেরকে চড় থাপ্পড় মারার পর যখন আমাদের ইন্দুর হয়ে মার খাওয়া নিয়ে আফসোস করে তখন কখনো সে বলে, দুনিয়ায় কত ইন্দুর! আমরা খতিজার কথা বুঝি না, কিন্তু আমাদের মায়েরা এবং আমাদের মোটা বাড়িওয়ালি একটু সরে গিয়ে গলা নিচু করে বলে, বীরাঙ্গনা, পাকিস্তানি মেলেটোরি ধরছিল! আমরা এই কথা শুনি এবং আমাদের হাতের কাছের আইডিয়াল লাইব্রেরির আধুনিক বাংলা অভিধান বের করে দেখিঃ বীরাঙ্গনা = বীরের স্ত্রী লিঙ্গ। আমরা বুঝতে পারি আসলামের ফুপু খতিজা বীরের স্ত্রী লিঙ্গ ছিল, কিন্তু আমরা বুঝি না আমাদের মায়েরা এই কথা লুকিয়ে ফিসফিস করে কেন বলে।

নমুনা ২ ঃ ইন্দুর-বিলাই খেলার জন্ম।

মহল্লার লোকেরা বলে যে, ভূতের গলিতেই ইন্দুর-বিলাই খেলার জন্ম হয়। তারা বলে যে, একাত্তর সনে রাজাকাররা আসে এবং দক্ষিণ মৈশুন্দি শান্তি কমিটির মেম্বার মওলানা আব্দুল গফুরের নির্দেশে তারা মহল্লার ছেলেদের ক্লাব, অগ্রগামী

সংসদের টিনের ছাপরা ঘরে তাদের আস্তানা গাড়ে। তারা কয়েকদিন মহল্লায় লেফট রাইট করে, তারপর একদিন বিহারির চায়ের দোকানের কোনায়, ভূতের গলির রাস্তা যেখানে দুই ভাগ হয়ে জোড়পুল এবং পদ্মনিধি লেনের দিকে গেছে, দেখে যে, আব্দুল করিম উপুড় হয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কলের টেপের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে পানি খায়। তাকে দেখে রাজাকারদের এই দলের কমান্ডার, আব্দুল গনিরও পানির তেষ্টা পায়, সে আব্দুল করিমের কাছে এগিয়ে গিয়ে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে থাকা তার হোগায় লাঠি দিয়ে আস্তে করে একটা বাড়ি দেয় এবং তখন আব্দুল করিম ঘাড় কাত করে তাকালে বলে, ইকটু পানি খাই! আব্দুল করিম হয়তো বিরক্ত হয় অথবা হয় না, বলে, খান, কিন্তু চুইষা খাওন লাগব। তখন চারজন রাজাকার পানির কলের মুখ হাতের চেটো দিয়ে মুছে, নলের মুখে মুখ লাগিয়ে চুষে চুষে পানি বের করে খায়, আব্দুল করিম খাড়িয়ে খাড়িয়ে দেখে। পানি খাওয়া হয়ে গেলে আব্দুল গনি বলে, খাইলাম!

রাজাকারদের এই কথায় আব্দুল করিমের হঠাৎ উৎসাহ হয়, সে বলে, ভাল না?

- হঁ, ভাল। আইচ্ছা আপনেরে একটা কথা জিগাই?
- জিগান।
- আপনে এই মহল্লায় থাকেন না?
- হঁ, থাকি।
- তাইলে বাইতে না যায়া না, রাস্তার কলের পানি খান কেন?
- ভাল লাগে হের লাইগা খাই।

রাজাকাররা আবার একটু চুপ করে থাকে, তারপর আব্দুল গনি পুনরায় বলে, আপনেরে আর একটা কথা জিগাই?

- জিগান।
- এই মহল্লায় আপনেরা ভোট দেন নাই?
- দিছি।
- আপনেরা কারে দিছেন?
- এই মহল্লার সব মুসলিম লীগ।
- তবু আওয়ামী লীগ জিতলো?

এবার আব্দুল করিম চুপ করে থাকে।

- মহল্লায় বাড়ি কয়টা?
- অইবো চল্লিশ, পঞ্চাইশটা।
- লোক কত?
- অইবো পাঁচশ, একহাজার।
- সব আওয়ামী লীগ?

আব্দুল করিম চুপ করে থাকে।

- মহল্লায় হিন্দু নাই?
- আছিল, অখনেতো দেখি না।
- কয় ঘর হিন্দু আছিল?
- অইবো, আছে তিন/চাইর ঘর।
- অরা গেছে কই ?
- কি জিনি, ঠিক কয়া পারুম না।
- হালারা ইন্ডিয়া ভাগছে?

আব্দুল করিম আবার চুপ থাকে।

- মহল্লায় মুক্তিযোদ্ধা নাই?

আব্দুল করিম ভাবে।

- কয়া পারুম না, জানি না, মনে লয় মুক্তিযুদ্ধে কেউ যায়নিকা।

তখন রাজাকার কমান্ডার আব্দুল গনি তার হাতের লাঠিটা আব্দুল করিমের মুখের ওপর উঁচু করে ধরে নাচায়, বলে, ডরান? ডর লাগে?

- না, ডরামু ক্যালা!
- ডরাইবেন ক্যালা? খাড়ান, দেখেন না, মেলেটারি আয়ালোক, ডরাইবেন!

রাজাকারদের সঙ্গে গফুর মওলানা একমত হয়, তারপর ভূতের গলিতে ৩০ মে রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় পাকিস্তানি মিলিটারি আসে। ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, রাজাকার কমান্ডার আব্দুল গনি বেশি কথা বলতে গিয়ে তাদের উপকারই করেছিল, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মিলিটারি আসবে এবং তারা এ জন্য তৈরি ছিল। টিপু সুলতান রোডের মোড়ে মিলিটারির ট্রাক থামার সঙ্গে সঙ্গে মহল্লায় খবর হয়ে যায়, মিলিটারি যখন পায়ে হেঁটে ভূতের গলির ভেতর ঢোকে মহল্লার লোকেরা গাঁট্টি বোচকা মাথায় করে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বলধা গার্ডেন এবং হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভেগে যায়। মহল্লায় কোন লোক না দেখে পাকিস্তানি মিলিটারি দলের নেতা লেফটেনান্ট শরিফ ক্ষেপে, সে বলে, কেয়া বাত হায়, শালে লোগ সাব ভাগ গিয়া? গফুর মওলানা এবং রাজাকারদের কিছু বলার থাকে না। আব্দুল গনি বলে, হালারা চুহা হায়। পাকিস্তানি মিলিটারি তখন মহল্লায় ঘুরে ঘুরে পাঁচ/দশটা বাড়িতে আগুন লাগায়, তারপর ভূতের গলি ছেড়ে যাওয়ার সময় লেফটেনান্ট শরিফ বলে, হামলোগভি বিল্লি হায়, হাম ফির আয়েঙ্গে। মিলিটারি চলে যাওয়ার পর মহল্লার লোকেরা ফিরে আসতে শুরু করে, রাস্তার কলতলায় রাজাকারদের সঙ্গে পুনরায় আব্দুল করিমের দেখা হয়, তারা পুনরায় কলের নলে মুখ লাগিয়ে পানি খায়।

রাজাকারদের কমান্ডার আব্দুল গনি বলে, আপনেরে একটা কথা জিগাই?

- জিগান।
- মহল্লা থেইকা মুক্তিযুদ্ধে গেছে কয়জন?

আব্দুল করিম ভাবে।

- জানি না, আমি কয়া পারুম না, কেউ যায় নাই মনে লয়।
- কেউ যায় নাই মনে লয়, তাইলে মেলেটারি দেইখা ইন্দুরের মত ভাগছিলেন কেন?

আব্দুল করিম পুনরায় চুপ করে থাকে।

- আপনেগো আবার বিলাই দেখান লাগে।

মহল্লার লোকেরা বলে যে, রাজাকার কমান্ডার আব্দুল গনির কথার ভেতর বার বার ইন্দুর-বিলাইয়ের প্রসঙ্গ এসে যায়, কিন্তু তারপরও, সে তখন খেলার অবয়বটা সনাক্ত করতে পারে নাই। গফুর মওলানা পুনরায় রাজাকারদের সঙ্গে মিলিটারি দেখানোর বিষয়ে একমত হয় এবং পনর দিনের ভিতরে জুন মাসের ১৪ তারিখ সোমবার মহল্লায় আবার মিলিটারি আসে। ভূতের গলির লোকেরা আবার পালায়, মিলিটারি অলিগলির ভেতর দিয়ে হাঁটে এবং গফুর মওলানার পরামর্শ অনুযায়ী আরও পাঁচ/দশটা বাড়ি পোড়ায়,তারপর মিলিটারি চলে গেলে মহল্লার লোকেরা ফিরে আসে। রাজাকাররা পুনরায় মহল্লায় বের হয়, রাস্তার কল থেকে পানি খায়, তারপর আব্দুল করিমকে জিগায়, আপনেরে একটা কথা জিগাই? আব্দুল করিম এবার আগেই বুঝতে পারে আব্দুল গনি তাকে কি জিগাবে, সে বলে, জিগাইতে পারেন, কিন্তু আমি কয়া পারি নাতো কে মুক্তিযুদ্দে গেছে, আমার জানা নাইকা তো! তখন মওলানা আব্দুল গফুর পুনরায় রাজাকারদের সঙ্গে একমত হয় এবং দশ দিনের ভেতর, ২৪ জুন বিষুদবার দুপুরের পর মিলিটারি আসে এবং ভূতের গলির লোকেরা তাদের বাড়ির পিছনে, নর্দমার পানি ভরা জলার ওপর দিয়ে ভেগে যায়। পাকিস্তানি মিলিটারি গলির ভেতর দিয়ে হাঁটে, তারা একটা লোকের দেখা পায় না, তখন এই মিলিটারিদের নেতা লেফটেনান্ট শরিফ পুনরায় বিরক্ত হয় এবং গফুর মওলানার পরামর্শে তারা পুনরায় পাঁচ/দশটা বাড়ি পোড়ায়। কিন্তু লেফটেনান্ট শরিফের বিরক্তি তাতে কমে না, সে যখন বলে, রাজাকার লোগ কেয়া কারতা, ইয়ে শালে চুহা লোগকো ভাগনেছে কিউ নেহি রোকতা; তখন মওলানা গফুর প্রথম এই পুরো বিষয়টার ভেতর খেলার অবয়বটা লক্ষ করে, সে বিরক্ত নবীন মিলিটারি অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ইয়ে এক খেইল হায়, ইন্দুর-বিলাই খেইল হায়, চুহা-বিল্লি হায়! তারপর মহল্লার চল্লিশটা বাড়ির ভেতর কেবল খতিজা বেগমদের ৩১ নম্বর বাড়িটা ছাড়া অন্য সবগুলো বাড়ি ২৭ অক্টোবর বুধবার পর্যন্ত মোট দুইবার করে পোড়ে; তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ

দিয়ে, ডিসেম্বর মাসের প্রথমে কোন একদিন মহল্লার লোকেরা খতিজাদের বাড়িটাও জ্বলতে দেখে । পুরো একাত্তর সন জুড়ে মহল্লায় কালো ভাঙ্গা বাড়িঘরের ভেতর ভূতের গলির লোকেরা ইন্দুরের মত বাস করে, তারপর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরে তারা মহল্লার রাস্তায় রাজাকারদের আর দেখে না; এই সময় কোন একদিন সন্ধ্যায় আমাদের ইন্দুর-বিলাইয়ের সাথি আসলামের বাপ, আব্দুল কাদেরের বিধবা বড় বোন খতিজা আব্দুল গনিকে তাড়া করলে রাজাকাররা সকলে ভেগে যায় এবং তখন খতিজাদের বাড়িটা এতদিন পর একা একা পোড়ে ; তবে খতিজাদের বাড়ি পোড়ার বিষয়টি নিয়ে ভূতের গলির লোকদের বিভ্রান্তি হয় এবং এর সমাধান তারা কোন দিন করতে পারে না। ডিসেম্বরের ১৫ তারিখ বুধবার মহল্লার তিনজন মুক্তিযোদ্ধা যখন ফিরে আসে, কালো কয়লার মত বাড়িঘরের ভেতর থেকে ভূতের গলির লোকেরা বের হয়ে অগ্রগামী সংসদের পাশে মওলানা গফুরের বাড়ি গিয়ে দেখে বাড়িতে কেউ নাই, সবাই ইন্দুরের মত ভেগে গেছে, তখন মহল্লার লোকেরা এই বাড়িতে আগুন দেয়। কিন্তু তারপর ভেগে যাওয়া ইন্দুর, মওলানা আব্দুল গফুর, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর একদিন ভূতের গলিতে ফিরে আসে, এবং ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, তারা ইন্দুর-বিলাইয়ের কথা ভুলে যায়; অথবা তারা হয়তো আসলে ভোলে না।

**নমুনা ৩ ঃ খতিজার কথা ।**

আমরা, ইন্দুর-বিলাই খেলাইনা পোলাপান, খতিজার কথা ভুলি না, মহল্লার লোকেরাও না; ভূতের গলিতে মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা যখন দেখে মহল্লার সব বাসা পোড়ে কেবল খতিজাদেরটা অক্ষত থাকে, তাদের প্রথমে বিভ্রান্তি হয়। পরে সব জানা যায় এবং তাদের কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে আসে, কারণ তারা খুব শিগগিরই দেখে যে, খতিজাদের বাসায় রাজাকার কমান্ডার আব্দুল গনির খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়; অন্য রাজাকাররা অগ্রগামী সংসদের ছাপরা ঘরে নিজেরাই রান্না করে খেলেও আব্দুল গনি তিনবেলা খতিজাদের বাড়িতে খাবার খেতে আসে। মহল্লার লোকেরা বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কিভাবে ঘটে, তবে তাদের মনে হয় যে, বাড়ি পোড়ানোর ইন্দুর-বিলাই খেলা শুরু হওয়ার প্রথম দিনই যোগাযোগটা হয়; সেদিন মিলিটারি এবং রাজাকাররা যখন মহল্লায় বাড়ি পোড়াতে আরম্ভ করে, তখন লেফটেনান্ট শরিফ দুইজন সিপাই এবং আব্দুল গনিকে নিয়ে খতিজাদের বাড়িতে ঢোকে। ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, বিধবাদের জীবনে কোন কিছুর নেশা থাকা সবসময়ই খারাপ, এই নেশার জন্যই সে বিপদে পড়ে এবং বিপদ তারপর তাকে যেন আর ছাড়ে না! সেদিন খতিজার বাপ মা এবং ছোট ভাই আব্দুল কাদের পাকিস্তানি মিলিটারির ভয়ে ভেগে গেলেও, পিছনের গেট দিয়ে

বেরিয়ে যাওয়ার সময় শেষ মুহূর্তে খতিজার মনে পড়ে যে, তার গান শোনার এক ব্যান্ডের সিটিজেন রেডিওটা ঘরের ভেতর রয়ে গেছে এবং সে তখন দল ত্যাগ করে ফিরে আসে; রেডিওর গান শোনার নেশা তাকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। লেফটেনান্ট শরিফ এবং তার সিপাইরা পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগানোর পূর্ব মুহূর্তে খতিজা এসে ঘরে ঢোকে এবং এর ফলে খতিজার বাপের বাড়িটা আপাতত বেঁচে যায় কিন্তু সে নিজে বাঁচে না; সেদিন আব্দুল গনিকে বাড়ির উঠানে খাড়া করিয়ে রেখে লেফটেনান্ট শরিফ এবং তার সঙ্গি দুই সিপাই অনেক্ষণ ঘরের ভেতর থাকে, তারপর তারা যখন বের হয়ে আসে তখন খতিজাকে বাইরের দরজার চৌকাঠ ধরে বিষণ্নভাবে খাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আব্দুল গনি তখন চকিতে একবার যুবতী বিধবা খতিজা বেগমের দিকে তাকায়; মহল্লার লোকেরা বলে যে, প্রথম দিন মিলিটারির তাড়া খেয়ে ভেগে যাওয়ার সময় খতিজার পিছনে থেকে যাওয়ার বিষয়টা তারা খেয়াল করে নাই, পরে তারা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারে। সেদিন মিলিটারি খতিজাদের বাড়িতে অনেক্ষণ অবস্থান করার পর মহল্লার পাঁচ/দশটা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে চলে যায়, তারপর সন্ধ্যায় মহল্লার লোকেরা তাদের বাড়িতে ফিরে আসে। ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, খতিজাদের বাড়ির ঘটনা সম্পর্কে আব্দুল গনি গফুর মওলানাকে কিছু বলে না, বিষয়টা সে চেপে যায়; মিলিটারি আসে এবং মিলিটারি যায় কিন্তু খতিজাদের বাড়ি পোড়ায় না, তখন আব্দুল গফুর মওলানা তাকে জিগায়, ব্যাপার কি কওতো আব্দুল গনি? কিন্তু আব্দুল গনি পরিষ্কার করে কিছু বলে না, কারণ, সে বিষয়টা নিয়ে ভাবে; তারপর একদিন আব্দুল গনি ভাবনা চিন্তা শেষে মনস্থির করে এবং খতিজাদের বাড়িতে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় সে খতিজাদের বাড়িতে যায় এবং কিশোর আব্দুল কাদের দরজা খুলে বের হলে খতিজার কথা জিগায়। তারপর সে বাইরের ঘরটাতে গিয়ে কাঠের চৌকির ওপর বসে এবং তখন খতিজার সঙ্গে তার দেখা হয়, খতিজা ভিতরের ঘরের দরজার চৌকাঠে এসে খাড়ায়; সেদিন খতিজাকে দেখার পর আব্দুল গনি কাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে এই নারীর সঙ্গে কথা বলে। তার পরদিন থেকে মহল্লার লোকেরা আব্দুল গনিকে, কাদেরদের বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া আসা করতে দেখে এবং তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে, তাদের মনে হয় যে, খতিজা হয়তো তার লজ্জার বিষয়টা ঢেকে রাখতে গিয়েই এত কিছু করে। প্রথম দিন আব্দুল কাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার পর আব্দুল গনি যখন নিশ্চিত হয় যে, দরজার আড়ালে খাড়িয়ে খতিজার মা কথা শোনার চেষ্টা করছে না, সে খতিজাকে বলে, মেলেটারির লগে তুমি কি করছ আমি জানি! তার এই কথা শুনে হয়তো খতিজার রাগ এবং ঘৃণা হয়, হয়তো সে ভয় পায়, সে বলে, আমি কিছু করি নাইকা! কিন্তু রাজাকার কমান্ডার আব্দুল গনি তাকে রেহাই

দেয় না, সে বলে, আমারেও দেওন লাগব, নাইলে আমি কয়া দিমু! মহল্লার লোকেরা বলে যে, খতিজার সম্ভবত আর কিছু করার থাকে না, কিন্তু কয়েকদিন তাদের বাড়িতে আব্দুল গনি যাতায়াত করার পর তার হয়তো মনে হয় যে, বিনা কারণে তাদের বাসায় আব্দুল গনিকে যাতায়াত করতে দেখে মহল্লার লোকদের হয়তো সন্দেহ হবে, তখন তাদের বাসায় আব্দুল গনির ভাত খাওয়ার বুদ্ধি তারা বের করে, যাতে করে মহল্লার লোকদের মনে হয় যে, আব্দুল গনি খাবার খাওয়ার জন্যই কেবল আসে। তবে খতিজার পরিবারের পক্ষে শাক দিয়ে এই মাছ ঢাকা সম্ভব হয় না, লোকেরা সব কিছুই জানতে পারে; সব শুনে তাদের হয়তো রাগ এবং ঘৃণা হয়, হয়তো হয় করুণাও। তাদের মনে হয় যে, মেয়েটা হয়তো খুব বোকা ছিল, গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হয়তো ছিল না, হয়তো লজ্জা আর ভয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছিল সে; আব্দুল গনির কাছে ধরা দেয়ার একটা কারণ হয়তো ছিল তার বাপের বাড়িটা রক্ষা করা, কিন্তু পরিণতিতে বাড়ি এবং ইজ্জত দুইটাই যায়। সে তার একবার খোয়ানো সম্ভ্রম আব্দুল গনির কাছে পুনরায় খোয়ায়, তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন আগে যখন মহল্লার মানুষের চোখের সামনে তাদের বাড়িটা পোড়ে; তখন লোকেরা প্রথমে ভাবে যে, রাজাকার আব্দুল গনি ভেগে যাওয়ার আগে হয়তো বাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু পরে মহল্লার লোকেরা বলে যে, আসলে এই সময় খতিজার হয়তো অন্য এক ধরনের অনুভূতি হয়, তার হয়তো মনে হয় যে, পোড়া মহল্লার ভেতর একটা বাড়ি অক্ষত থাকাটা অশ্লীল, হয়তো এ কারণে তার লজ্জা হয় এবং সে তার বাপের বাড়িটা আগুন লাগিয়ে পোড়ায়। সেদিন মহল্লার লোকেরা যখন আগুন লাগা বাড়িটার কাছে যায় তারা আব্দুল জলিল, কাদের, খতিজা এবং খতিজার মাকে বাড়ির কাছে রাস্তার ওপর বসে থাকতে দেখে। তখন মহল্লার লোকদের দেখে খতিজা ফিস ফিস করে বলে, আল্লায় বিচার করবো; এই কথা শুনে মহল্লার লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই কথা সে যেদিন বলে সেই দিন আব্দুল গনি ভেগে যাওয়ার সময় ফরাসগঞ্জে বুড়িগঙ্গার কিনারায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে এবং মুক্তিযোদ্ধারা তাকে নদীর পাড়ে খাড়া করে গুলি করে মারে।

নমুনা ৪ ঃ হুমু/জাহুর কাণ্ড ।

আমরা, ৩২ নম্বর বাঘওয়ালা বাড়ির ভাড়াইটা পোলাপান, ভূতের গলিতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দুর-বিলাই খেলার দেখা পাই; কিন্তু আমরা বুঝতে পারি, এই মহল্লার লোকেরা এই কথা বলতে ভালবাসে যে, তারা ইন্দু-বিলাই খেলার কথা ভুলে গিয়েছিল! ভূতের গলির লোকদের হয়তো মনে হয় যে, তারা এই খেলার কথা ভুলে যেতে চায়, তাই তারা বারে বারে ভুল করে বলে, তারা ভুলে

গেছে; বস্তুত মহল্লার মানুষ এই বিভ্রান্তির ভেতর তাদের জীবন কাটায়। অনেক বছর পর, ২য় সহস্রাব্দের শেষ দুই দশকে এই দেশের রাজনীতি এক বিশেষ মোড় নেয় এবং এর অনুষঙ্গ হিসাবে মহল্লার লোকদের চোখের সামনে উত্থান হয় হুমু জাহুদের; হুমু হচ্ছে মোঃ হুমায়ুন কবির এবং জাহু হচ্ছে মোঃ জাহাঙ্গির হোসেন, তারা মসজিদের পিছনের গলির আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপারির ম্যাট্রিক পাশ কিন্তু আইএ ফেল দুই ছেলে; আইএ বা এইচএসসি ফেল করার পর তারা টুকিটাকি বদমায়েশি করে হাত পাকায়, তারপর মহল্লার যুবনেতা ইব্রাহিম খানের সঙ্গে চলাফেরা করতে করতে দ্রুত ছিঁচকে থেকে ধাড়ি হয়ে ওঠে। মহল্লার লোকেরা পরে বলে যে, দুই ভাই তাদের চোখের সামনেই বড় হয়, কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই, তারা ভূতের গলিতে ইন্দুর-বিলাই খেলার এক নতুন নিয়ম চালু করে এবং মহল্লার লোকেরা যখন এই খেলার কথা শোনে, তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে হয় যে, এরকম কোন কিছুর কথা তারা আগে কোন দিন শোনে নাই! তবে তারা প্রথম যখন বা যেদিন সবকিছু জানতে পারে, তাদের ভয় লাগে, কিন্তু তাদের মনে হয় যে, এটা হয়তো একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র, কোন খেলা না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা দেখে যে, তাদের ধারণা ঠিক ছিল না, দুই সহস্রাব্দের শেষ প্রান্তে খাড়িয়ে আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপারির দুই ছেলে, হুমু এবং জাহু ইন্দুর-বিলাইয়ের এক বিধ্বংসী সংস্করণ মহল্লায় চালু করে; ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কেরানি আলতাফ আলিকে দিয়ে খেলাটা শুরু হয় এবং মহল্লার লোকেরা তা জানতে পারে। মহল্লার লোকেরা বুড়া বিহারির চায়ের দোকানে বসে বিকালে অথবা সন্ধ্যায় চা এবং নিমকপারা অথবা আলুপুরি খায় এবং আলাপ করে; তারা যখন শোনে হুমু এবং জাহু, আলতাফ আলিকে ইন্দুর ঘোষণা করেছে তারা বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারে না, তারা বলে, এইটা আবার কি? এবং হয়তো আলতাফ আলিও ব্যাপারটা কি বুঝতে পারে নাই। হুমু ওরফে হুমায়ুন এবং জাহু ওরফে জাহাঙ্গির একদিন সন্ধ্যার পর আলতাফ আলির ৬০ নম্বর বাসায় যায়, আলতাইফা আলতাইফা, বলে ডাকে, তখন প্রথমে আলতাফ আলির রোগা পটকা স্ত্রী সুপিয়া আক্তার বাইরের গেট খুলে খাড়িয়ে তাদের দেখে এবং বলে, ডাক পারেন ক্যালা, অয়তো বাইতে নাই। সুপিয়া তখন রাস্তার অন্ধকারের ভেতর হুমায়ুন এবং জাহাঙ্গিরের মুখ দেখতে পায় না, সে বলে, বাইতে আইলে কিছু কমু? মহল্লার লোকেরা পরে বলে যে, হুমু এবং জাহু তখনও হয়তো খেলার কাঠামোটা পুরোপুরি ঠিক করতে পারে নাই, ফলে মনে হয় যেন খেলাটা অতিদ্রুত এক দিকে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যায় সুপিয়া আক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা বলে, বাইতে আইলে কইয়েন আমরা তারে ইন্দুর ডিকলার দিছি! সুপিয়া হয়তো এরকম কিছু শোনার কথা ভাবে নাই, তার হয়তো

মনে হয় যে, এই সন্ধ্যার সময় বাড়ি বয়ে এসে কেউ এরকম কথা বলে না; হয়তো সে তাদের কথা ঠিকমত শুনতেও পায় নাই, ফলে সে জিগায়, কি কইলেন বুজবার পারলাম না! সেই সন্ধ্যায় এটাও মনে হয় যেন একটা খেলা হয়ে ওঠে, দুই ভাই কোমরে হাত দিয়ে খাড়িয়ে পুনরায় বলে, ইন্দুর, আলতাপ আলিরে আমরা ইন্দুর ডিক্লার করছি। কিন্তু কাহিল চেহারার সুপিয়ার মনে হয় যে, সে হয়তো আসলেই ঠিকমত শুনতে পাচ্ছে না, এবং সে আবার বলে, আমি বুজা পারতাচি না, ইন্দুর কি করছেন?

- আলতাপ আলিরে আমরা ইন্দুর ডিকলার করচি!
- ক্যালা, এইটা কি?

মহল্লার লোকেরা এই ঘটনার কথা জানতে পারে এবং বিহারির হোটেলে বসে চা খাওয়ার সময় তাদের তখনই মনে হয় যে, এটা হয়তো পুরানো একটা খেলা, খেলাটাকে হুমু এবং জাহু এক অকল্পনীয় পরিণতিতে নিয়ে যায়। ভূতের গলির বুঝতে পারে না হুমু এবং জাহু কেন এই খেলা খেলে, তাদের মনে হয় যে, এটা হয়তো নিছক ইয়ার্কি, অলস সময়ের কারণে মহল্লায় মশকারি করে বেড়ায়; তারা হুমু জাহুকে এ জন্য গাল দিয়ে হাসে, বলে, হালার নাটকির পোলারা বিটলামি করে! কিন্তু পরে দেখা যায় যে, এই খেলাটা বিটলামির চাইতে অনেক বেশি কিছু ছিল; তখন মহল্লার লোকদের সামনে যে প্রশ্নটা সমস্যা হয়ে দেখা দেয় তা হচ্ছে, হুমু এবং জাহু আলতাফ আলির সঙ্গে এরকম কেন করে? কি করেছে আলতাফ আলি?

- হয়তো চান্দা চাইছিল, দেয়নিকা, তারা বলে।

কিন্তু তাদের মনে হয় যে, এটা ঠিক না; একটা কেরানির কাছে চান্দা চেয়ে কি লাভ!

- তাইলে মনে লয় ফিলিম দেখনের লাইগা ভিচিপিটা চাইছিল; দেয়নিকা।

কিন্তু তাদের মনে হয় যে, হুমু জাহুর কি ভিসিপির অভাব আছে? অভাব নাই।

- তাইলে হয়তো আলতাফ আলির বৌ অগো উঠানে পানি ফেইকা ফালাইছিল।

কিন্তু সুপিয়া আক্তার কেন বিনা কারণে প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে পানি ছুড়ে ফেলবে তা বোধগম্য হয় না।

- তাইলে হয়তো রাস্তা দিয়া যাওনের সুময় আলতাফ আলি ওগো সালাম দেয়নিকা, হের লাইগা ক্ষ্যাপছে!

কিন্তু ভূতের গলির লোকদের মনে হয় যে, কেবলমাত্র রাস্তায় সালাম না দেয়ার কারণেও এরকমের ইন্দুর-বিলাই সম্ভব না, অথবা হয়তো সম্ভব; কিন্তু

তারপরেও তাদের বিশ্বাস হয় না এবং তখন হয়তো তারা তাদের পুরানো প্রসঙ্গে আবার ফিরে যায়; আলতাফ আলিকে হুমু জাহ্ তাদের নব আবিষ্কৃত খেলার ইন্দুর কেন বানায়, তা তারা বুঝতে পারে না । তবে তারা পরে বলে যে, আলতাফ আলির সঙ্গে হুমু জাহুর এই খেলা জমে নাই, কারণ, আলতাফ আলি খেইলের নিয়মটাই বুঝতে পারে নাই; আলতাফ আলির পর হুমু জাহ্ যখন বাপ মা মরা মোহাম্মদ সেলিমকে ইন্দুর বানায় তখন খেলাটা জমে উঠতে পারতো, কিন্তু মাঝখানে খতিজা এসে পড়ায় এবারও সব ভন্ডুল হয়ে যায়। হুমু জাহ্ যেদিন আলতাফ আলির বাসায় গিয়ে তাকে ইন্দুর ঘোষণা করে আসে, সেদিন রাতে তার রোগা পটকা বৌ তাকে বলে যে, হুমু আর জাহ্ এসে তাকে ইন্দুর ডিকলার করে গেছে। আলতাফ আলি হয়তো সুপিয়া আক্তারের কথা শুনতে পায় না, অথবা হয়তো শুনতে পায়, কিন্তু কথার অর্থ বোঝে না, সে বলে, ভালা করছে, হালারা মহল্লার ভিতরে মাস্তানি করে! ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, আলতাফ আলির এই বুঝতে না পারার বিষয়টা খুবই মরাত্মক প্রমাণিত হয়, হুমু জাহ্ যখন দেখে যে, আলতাফ আলি খেলে না, তারা দ্বিতীয় বারের মত তার বাসায় যায়, কিন্তু তাকে না পেয়ে পুনরায় সুপিয়া আক্তারের সঙ্গে কথা বলে, আপনের খসমরে আমরা ইন্দুর ডিকলার করছি, হ্যারে আপনে কন নাইকা? সুপিয়া যখন জানায় যে, সে বলেছে এই কথা, কিন্তু তারা বুঝতে পারে নাই এর মানে কি; তখন দুই ভাই বলে, ইন্দুর হইচে লৌড়ায় না ক্যালা? হ্যারে, কইবেন আমাগো দেখলে লৌড়াইতে। তখন সুপিয়া হয়তো হুমু জাহুর কথা আলতাফ আলিকে আবার বলে এবং আলতাফ আলি হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে তারপরেও এই কথার মানে বুঝতে পারে না; ফলে তখন একদিন বিকালে অথবা সন্ধ্যায় মহল্লার রাস্তায় হুমু জাহুর সঙ্গে আলতাফ আলির দেখা হয় এবং এর দ্বারা তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। মহল্লার লোকেরা বলে যে, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের আচরণের পরিবর্তনের পরিমাণ সম্পর্কে তারা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল; সেদিন সন্ধ্যায় অথবা রাতে আলতাফ আলিকে হুমু এবং জাহ্ 'নিউ রাইজিং স্টার ক্লাব' ঘরে ডেকে নিয়ে যায়, তারপর আলতাফ আলি আর জীবিত তার বাসায় ফেরে না। রাত গভীর হওয়ার পরও বাসায় না ফিরলে তার স্ত্রী, হুমু জাহুর বাসায় গিয়ে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে, তারা তাকে বলে যে, আলতাফ আলি তাদের সঙ্গে কথা বলে তখনই চলে গেছে, তারপর সে কোথায় গেছে তারা জানে না; হয়তো সে অন্য কোথাও গেছে, সকালেই ফিরে আসবে। আলতাফ আলি সকালে ফেরে না, দক্ষিণ মৈশুন্দির গলির ম্যানহোলের ভেতর থেকে চাক্কুর ঘাইয়ে পেট চিরে উন্মুক্ত করে ফেলা তার লাশ আবিষ্কৃত হয়। সুপিয়া আক্তার এবং তার রোগা ছেলেমেয়েরা কাঁদে, দুপুরে সূত্রাপুর থানার পুলিশ এসে ময়না তদন্তের জন্য লাশ

নিয়ে যায়; এবং মহল্লার লোকেরা এই বিভিষিকা দেখে স্তব্ধ হয়ে থাকে। আলতাফ আলির দাফন হয়ে যাওয়ার পরদিন খুব সকালে পুলিশ হুমু জাহুকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে কোর্টে চালান করে; মহল্লার লোকেরা বলে যে, তাদের মনে এই ঘটনায় আশা জাগে, কিন্তু এই আশা শেষ হতে সময় লাগে না; একদিন অথবা দুইদিন পর হুমু এবং জাহু জামিন নিয়ে ফিরে আসে, তখন নিহত আলতাফ আলির বিধবা স্ত্রী, হত্যা মামলার বাদি হওয়ার কারণে দুটো ছেলেমেয়ে বগলে নিয়ে হুমু জাহুর ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করে এবং তখন এটাও হয়তো একটা খেলা হয়। তারপর তারা, ভূতের গলির লোকেরা, এই অবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে ওঠে এবং দ্রুত আলতাফ আলি এবং হুমু জাহুর কথা ভুলে যেতে চায়। মহল্লা এবং দেশে বিপর্যয় ও পতনের ভেতর তারা বিহারির চায়ের দোকানে অবসরে বসে চা আর নিমকপারা খায়, গল্প করে, অদৃশ্য কাউকে 'মান্দার পোলা' অথবা 'নাটকির পোলা' বলে গাল দিয়ে হাসে। কিন্তু তারা দেখে যে, ভেগে যাওয়ার কোন উপায় নাই, তারা ক্রমাগত আক্রান্ত হয়; কারণ, হুমু জাহুরা ক্রমাগত এই ক্রীড়ায় লিপ্ত থাকে, আলতাফ আলির নিহত হওয়ার কারণ মহল্লার লোকেরা জানতে না পারলেও, হুমু জাহুর ইন্দুর-বিলাই খেলার ভয়াবহতার বিষয়টা সকলের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তখন তারা বিহারির দোকানে বসে চা খাওয়ার সময় হুমু জাহুর নতুন ইন্দুরের খবর পায়; হুমু জাহু, মোহাম্মদ সেলিমকে ইন্দুর ডিকলার করে। বিহারির চায়ের দোকানে বসে মহল্লার লোকেরা মোহাম্মদ সেলিমের ইন্দুর হওয়ার কথা শোনে এবং তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, তাদের কেউ কেউ মোহাম্মদ সেলিমের বুইড়া দাদির কাছে গিয়ে বলে, মোহাম্মদ সেলিমরে হুমু জাহু ইন্দুর বানাইছে! তাদের কথা শুনে রাবেয়া তাকিয়ে থেকে বলে, আমি কি করুম? ভূতের গলির এই লোকেরা তখন চুপ করে থাকে, তাদের মনে হয় যে, এই প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা নাই। কিন্তু আলতাফ আলির কথা আসলে যেহেতু তারা ভুলতে পারে না এবং মহল্লায় আব্দুর রাজ্জাক ব্যাপারির ছেলেদের নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশের পর তাদের যেহেতু প্রবল ভয় হয়, তারা মোহাম্মদ সেলিমের দাদির কথা শুনে চুপ করে ভাবে এবং জুতার আগা দিয়ে মাটিতে আঁকিবুকি কাটে, তারপর বলে, কি করবেন আমরা কয়া পারি না, তয় রাজ্জাক ব্যাপারির বাইতে যায়া জিগান মোহাম্মদ সেলিমে কি করছে, কন যে, যা করছে করছে, আর করব না! ফলে মোহাম্মদ সেলিমের বুইড়া দাদি সেদিন বিকালে, তক্ষনি মসজিদের পিছনে রাজ্জাক ব্যাপারির বাসায় যায়, কিন্তু হুমু জাহুকে বাসায় পায় না, তারা তাদের নেতাদের সঙ্গে মিটিং কিংবা মিছিলে গেছে; রাবেয়া তখন ফিরে আসে, মগরেবের নামাজের পর আবার যায় এবং দেখে যে, হুমু জাহু ফেরে নাই। বুড়ি রাবেয়ার এত আতঙ্ক হয়, সে ক্রমাগত চেষ্টা করে এবং রাত এগারটার পরে এক

সময় সে যখন গিয়ে বাড়ির বাইরের দরজা ঠকঠকায়, হুমু জাহু ভিসিপি দেখা থেকে উঠে এসে দরজা খুলে খাড়ায়। তারপর তাদের সঙ্গে তার যে কথা হয় মহল্লার লোকেরা তা জানতে পারে, তারা বলে যে, এত রাতে রাবেয়াকে দেখে তারা দুই ভাই ভয়ানক ক্ষেপে, বলে, এত রাইতে আইছেন ক্যালা?

- বাবা, আমরা খুব ডরাইছি বাবা!
- ডর কিসের?
- বাবা, তুমরা মহল্লার পোলাপান, অরে তুমরা মাফ কইরা দেও, আমি তুমাগো পায়ে ধরি!
- আমরা কি আপনেরে কইছি আমাগো পায়ে ধরেন, আজাইরা প্যাঁচাল না পাইড়া বাইত যান।
- এতিম পোলাটা বাবা, অয় কি করছে কও, আমি অরে মাইরা ফাটামু ।
- আপনের ফাটানের কাম নাইকা!
- অয় কি করছে কও আমারে!
- কি করছে জানি না ।
- বাবা দয়া কর, আমি বুইড়া মানুষ!

তখন হুমু জাহু বলে, অয় অখন থন ইন্দুর, অরে আমাগো দেখলে দৌড়াইতে কইয়েন; তারপর তারা রাবেয়ার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। মহল্লার লোকেরা পরদিন অতি ভোরে মসজিদে ফজরের নামাজের আজান দেয়ারও আগে তাদের দরজায় ঠকঠকানির শব্দ শোনে এবং ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে যে, মোহাম্মদ সেলিমের বিপন্ন দাদি তাদের দরজার সামনে খাড়িয়ে। সেদিন বৃদ্ধা রাবেয়া মহল্লার লোকের দুয়ার থেকে দুয়ারে সহায্য প্রর্থনা করে, কিন্তু সময়ের এই প্রান্তে এসে ভূতের গলির লোকদের হুমু জাহুদের বিষয়ে কিছু করার থাকে না, তারা তাদের সাহস এবং শক্তির অভাব টের পায়, তারা এই বৃদ্ধা নারীর সামনে চুপ করে মাথা নত করে রাখে, বলে, থানায় যায়া কেস দেন। তখন রাবেয়া ৩১ নম্বর বাড়িতে যায়, আসলামের বাপ, আব্দুল কাদের, মহল্লার অন্য লোকের মত চোখ নামিয়ে বাড়ির বাইরের প্রাঙ্গণের ওপর খাড়িয়ে থাকে। খতিজা ফজরের নামাজ পড়ার জন্য অজু করে জায়নামাজ বিছাচ্ছিল, তখন এত সকালে উঠানে মানুষের কথার আওয়াজ পেয়ে বের হয়ে সে আব্দুল কাদেরের পিছনে এসে খাড়ায়, বলে, কি অইছে খালা! ভূতের গলির লোকেরা এই ঘটনার কথা বিহারির দোকানে বসে বহুদিন বহুভাবে বর্ণনা করে, তারা বলে যে, খতিজার কথা শুনে রাবেয়া একদম ভেঙে পড়ে, আকুল হয়ে হাউমাউ করে, হুমু জাহু মোহাম্মদ সেলিমরে ইন্দুর বানাইছে, আমার এতিম পোলাটারে অরা মাইরা ফালাইব। মহল্লার সব লোকের মত হুমু জাহুর কাণ্ড সম্পর্কে হয়তো খতিজা বেগমের

জানাছিল, সে উঠানের ধুলার ভেতর পড়ে থাকা বৃদ্ধাকে দুই হাত ধরে টেনে তোলে এবং দুই হাতের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে বলে, ডরান ক্যালা, আমরা আছি না মহল্লায়! তার এই কথায় হয়তো রাবেয়া ভরসা পায় না, সে ঘোলা চোখে তাকিয়ে যখন বলে, অরে কয় লৌড়াইতে, অয় পোলাপাইন, অয় কই যাইব; তখন খতিজা বলে, অরে আমাগো বাইতে রাইখা যান, দেখি অরে ক্যাডা কি করে। তখন, মহল্লার লোকের সামনে সম্ভবত জীবনে প্রথম বীরাঙ্গনা খতিজা প্রকাশিত হয়, সেদিন তার নামাজ কাজা হয়ে যায়, সে আসলামের বাপ আব্দুল কাদেরের আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাবেয়াকে হাত ধরে রাজ্জাক ব্যাপারির বাসায় নিয়ে যায়, সেখানে হুমু জাহুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার পর তাদেরকে বলে, তুমরা মহল্লায় যা মনে লয় কর, আমার কিছু না, তয় মোহাম্মদ সেলিম আমাগো বাইতে আমার লগে থাকব, লৌড়াইব না, তুমরা অর শইলে যুদি নিকি আত দেও আমি তুমাগো ঠ্যাং ভাইঙ্গা দিমু ! খতিজার সাহসের এই হিসাবে হয়তো ভুল ছিল, কারণ, সে হুমু জাহুদের চিনতে পারে নাই, তার হয়তো মনে হয়েছিল যে, মহল্লার পোলা ছুটুকাল থেকে দেখে আসছে, হয়তো ধমক দিলে ভয় পাবে; কিন্তু হুমু জাহু ভয় পায় না, তারা খতিজার হুমকির মুখে প্রথমে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং পরদিন সাঙ্গপাঙ্গসহ দল বেঁধে আসলামদের বাড়িতে যায়। তারা আসলামদের বাড়ির ভেতর জর্দার কৌটা বোমা ছুড়ে মারে এবং গালাগালি করে, বুইড়া রান্ডি, তর টেংরি ঝুলামু, তুই মানুষ চিনস নাইকা; তারা তার পরদিন আবার আসে এবং বোমা ফাটিয়ে চিৎকার করে। আসলামদের বাড়িতে সবাই দরজা জানালা লাগিয়ে বসে থাকে এবং মহল্লার অন্য লোকেরা ভয়ে এগোয় না; তখন ঘটনাটা শামসুল আলম খানের কানে যায় এবং মহল্লার লোকেরা বলে যে, শামসুল আলম খান বুইড়া হয়ে গেলেও খতিজাকে ভোলে নাই; সেদিন সে তার ছেলে ইব্রাহিম খানকে ডেকে আনে এবং বলে, তুমার পোলাপানগো খতিজার লগে লাগতে মানা কর, নাইলে খরাপ অইবো! তখন হুমু জাহুর আবিষ্কৃত ইন্দুর-বিলাই খেলাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, এবং আমরা, ভূতের গলির আসল ইন্দুর-বিলাই খেলাইনা পোলাপান, ধার করে বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান নামক ঢাউস বইটা নিয়ে আসি এবং খুলে ৮২৪ পৃষ্ঠায় পাঠ করিঃ বীরাঙ্গনা- ১বি. বীর নারী, বীর্যবতী নারী (আমি বুঝলাম সে বীরাঙ্গনা আফগানের মেয়ে--নজরুল) । ২বি. বীরপত্নী। [বীর+অঙ্গনা, স.]।

নমুনা ৫ ঃ খতিজার আরো কিছু কথা।

বাংলা একাডেমীর অভিধান পাঠ করার পরদিন সে আমাদের মায়েদের সঙ্গে গল্প করতে আসে, আমরা তার ফেকাসে লাল মুখের দিকে তাকাই এবং আমাদের

মাথায় যদি হাত বুলিয়ে দেয় এই আশায় তাকে 'ফুফু' বলে ডকি; কিন্তু মোটকি পারভিন সুলতানা চাপা স্বরে বলে, স্বভাব ভালা আছিল না, এবং মহল্লার লোকেরা বলে যে, খতিজার আসলে কপাল ছিল খারাপ, একাত্তর সনে তার বিপদ আসে ক্রমাগত । মহল্লার লোকেরা বলে যে, একাত্তর সনে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকেই নারিন্দা, দক্ষিণ মৈশুন্দি, জোড়পুল, বনগ্রাম ইত্যাদি এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ফিরতে থাকে এবং ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভূতের গলির মাসুদ আলম এবং মুনির হোসেন পিঠে স্টেন গান এবং এসএলআর ঝুলিয়ে ফিরে আসে; তখন মহল্লার লোকেরা তাদের পোড়া বাড়ি এবং দুর্গতির কথা বিস্মৃত হয়, তারা রাস্তায় নেমে আসে এবং মাসুদ আর মুনিরকে ঘিরে ধরে, তারা তাদের আগ্নেয়াস্ত্রে হাত বুলায়, লম্বা হয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা বুনো চুল হাত দিয়ে নেড়ে দেয়,বলে, ফিরা আইলা তুমরা, এবং তখন খতিজা সিলভারের জগে করে শরবৎ বানিয়ে আনে, বলে, তুমাগো লাইগা বানাইছি, খাওন লাগব, তুমরা আমাগো ভাই না? মহল্লার লোকেরা বলে যে, সেদিন তারা গ্লাসে করে মাসুদ আলম এবং মুনির হোসেনের সঙ্গে খতিজার বানানো শরবৎ খায়। কিন্তু তারপর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ফেরে দোলাইখালের লোহালক্কড়ের দোকানদার ত্রিশ বছর বয়স্ক শামসুল আলম খান, তারও চুল লম্বা এবং পিঠের ওপর একটা বন্দুক, মহল্লার লোকেরা তার কথা শুনে পুনরায় রাস্তায় বের হয়ে তার কাঁধে এবং পিঠে চাপড় দেয়, বলে, ফিরলা, এবং খতিজা পুনরায় সিলভারের জগে শরবৎ বানায়, শামসুল আলম খান এই শরবৎ খায়। এটা ঠিক যে, খতিজা হয়তো তার মনের আনন্দেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাবর্তনে শরবৎ বানিয়ে খাওয়ায়, কিন্তু এই শরবৎ খাওয়ার পরেও, এক সপ্তাহের ভিতর একদিন সন্ধ্যা বেলা শামসুল আলম খতিজাদের বাড়িতে আসে এবং তার বাপ আব্দুল জলিলের কাছে রাজাকারদের ভাত খাওয়ানোর কারণ জানতে চায়, এবং সে যখন সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারে না, তখন শামসুল আলম বলে, আপনে আমার লগে আহেন। মহল্লার লোকেরা বলে যে, তখন খতিজার নসিব পুনরায় তাকে প্রতারিত করে, সে ভেতরের ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলে, আমার বাপমায়ের দুষ নাই, রাজাকাররে ভাত আমি খাওয়াইছি। শামসুল আলমের হয়তো এ সব গল্প জানা ছিল; সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে না, বলে, তাইলে তুমি আহ আমার লগে, এবং খতিজার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় । তারপর, শামসুল আলম দক্ষিণ মৈশুন্দির গলির মুখে তাদের দোতলা বাড়ির ছাতের চিলে কোঠায় খতিজাকে তিন দিন আটকে রাখে; এই খবর যখন প্রকাশিত হয়, তখন মাসুদ এবং মুনির হোসেন এসে তাকে বাড়ি পৌছে দেয়। শামসুল আলমের বাপ, সিরাজ ব্যাপারি, এই ঘটনার পর কোন একদিন খতিজাদের বাসায় আসে এবং আব্দুল জলিলের কাছে

শামসুল আলমের সঙ্গে খতিজার বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, খতিজার দেহ মনে শামসুল আলমের জন্য কিছু অবশিষ্ট ছিল না; ফলে, আব্দুল জলিল কিছু বলার আগেই খতিজা ভিতরের ঘর থেকে বের হয়ে আসে এবং বলে, আপনে যান! সেদিন যখন সিরাজ মিঞা ব্যাপারি চলে যাওয়ার জন্য চেয়ার থেকে ওঠে তখন খতিজা বলে, আল্লায় বিচার করব, আল্লারঠে বিচার দিছি, এবং মহল্লার লোকেরা পরে বিহারির দোকানে বসে বলে যে, শামসুল আলমের বাঁচার আর উপায় থাকে না।

নমুনা ৬ ঃ ধুতুম পক্ষী।

আমাদের ইন্দুর-বিলাইয়ের সাথি আসলামের বোন, ফাতেমা জহুরা, যখন আমাদের সঙ্গে খেলতে চায় আমরা তাকে এই খেলায় নেই না, সে ৩৫ নম্বর বাড়ির চন্দ্রকান্তের মেয়ে পূর্ণলক্ষ্মীর সঙ্গে রান্দা-বাড়ি খেলে, তবে, আমরা, মহল্লায় ইন্দুর বিলাই খেলা বালকেরা কখন কখন তাদের সঙ্গে রান্দা-বাড়া খেলায় যোগ দেই, তারা মহা উৎসাহে আমাদেরকে নেয়। দুই বালিকা, ফাতেমা জহুরা এবং পূর্ণলক্ষ্মী বসাক, তাদের ফ্রকের নিচের অংশ পিছন দিক থেকে টেনে তুলে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দশ ইঞ্চি ইটের ওপর পিঁড়িতে বসার মত বসে থাকে এবং পরস্পর কথা বলে, হেঁ ভাই না ভাই, দেও ভাই যাও ভাই! তখন আমরা ছেলেরা গাছের লতাপাতা, সুরকির গুঁড়া, ধুলাবালি ইত্যাদি যোগড় করে আনি, আমরা বলি, বাজার কইরা আনলাম; তারপর জহুরা এবং পূর্ণলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আমরা পায়ের গোড়ালির নিচে আধলা ইটা গুঁজে দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে কুত্তার মত বসে অপেক্ষা করি; জহুরা বলে, মরিচ কই? আমরা দৌড় দিয়ে গিয়ে আস্তর খসা দেয়ালের নোনা ধরা ইটের গুঁড়া সংগ্রহ করে আনি, পূর্ণলক্ষ্মী বলে, খাওয়ার থালি কই, খাইবা কিসে? আমরা মামুনদের ২৫ নম্বর বাসার দিকে আবার দৌড় দেই, বড় কাঠাল পাতা ভেঙ্গে নিযে আসি; দুই বালিকার তত্ত্বাবধানে আমাদের খেলা চলে। তখন কখনো আমাদের ঝগড়া হয়, হয়তো পূর্ণলক্ষ্মীর সঙ্গে কাইজা করি, সে রাগ করে তার মাথার আঁচল নামিয়ে মন্দিরের রাস্তার কিনারার রোয়াকে গিয়ে মুখ ভার করে বসে, আমরা তখন খেলা ফেলে সকলে এসে এই নিচা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসি এবং ছড়া কাটিঃ

পূর্ণলক্ষ্মী
ধুতুম পক্ষী
আশির্বাদ করি কাছিমের প্যাটে
তেলাচোরায় যেন গাল চাটে

এই ছড়ার মানে কি আমরা জানি না, কিন্তু পূর্ণলক্ষ্মী ক্ষেপে গিয়ে আমাদেরকে তাড়া করে; আমরা দৌড়াদৌড়ি করি, হৈহৈ করি, আমাদের আর এক ধরনের মজা হয়। আমরা জহুরা এবং পূর্ণলক্ষ্মীর সঙ্গে রান্দা-বাড়া খেলার কথা আমাদের মা বাপদের বলি না, কিন্তু মহল্লায় এই কথাও ফাঁস হয়ে যায়; তারপর আমরা যখন খেলা শেষে ঘরে ফিরি আমাদের মায়েরা আমাদের দিকে তাকায়, আমাদের ৩২ নম্বর বাড়ির বাড়িওয়ালি পারভিন সুলতানাও আমাদেরকে দেখে, আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকি যে, ইন্দুর-বিলাই না খেলার কারণে আমাদের নাক-মুখ নিশ্চয়ই ফাটা রক্তাক্ত দেখায় না, কাপড় জামাও নিশ্চয়ই পরিষ্কারই লাগে, কিন্তু আমাদের মায়েরা তবুও সন্তুষ্ট হয় না, তারা বলে, মাইয়াগো লগে যাছ রান্দা-বাড়ি খেলনের লাইগা? হায় আল্লাহ! আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে, আমরাতো রান্দি না, বাজার করি, মরিচ এনে দেই, তেল এনে দেই, রান্দেতো জহুরা আর পূর্ণলক্ষ্মী; কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালি পারভিন সুলতানা আমাদের কথা শুনে পুনরায় নাক কুঁচকে বলে, রান্দা-বাড়ি খেলচ, মায়ালোক নিহি তরা!

তখন মহল্লায় এবং দেশে ইলেকশন আসে, আমরা ইন্দুর-বিলাই, রান্দা-বাড়ার পাশাপাশি নতুন একটা খেলা পাই, খেইলের নাম, ভোট দিবেন কিসে; বাবুল মিঞা এই খেলায়ও নেতা হয়, আমরা সব পোলাপান দল বেঁধে সকাল বিকাল বাবুলের নেতৃত্বে মহল্লার রাস্তায় মিছিল করে হল্লা করিঃ

ভোট দিবেন কিসে? রকেট মার্কা বাক্সে।
তোমার ভাই, আমার ভাই। মিলন ভাই, মিলন ভাই।
ভোট দিবেন কিসে? এরোপ্লেন মার্কা বাক্সে।
তোমার ভাই, আমার ভাই। কালাম ভাই, কালাম ভাই।
কালাম ভাই যেখানে, আমরা আছি সেখানে।
মিলন ভাই যেখানে, আমরা আছি সেখানে।

আমরা এই হৈচৈয়ের মধ্যে পূর্ণলক্ষ্মীর কথা ভুলে যাই, আমাদের এই নির্বাচনি মিছিলে জহুরা যোগ দেয় কিন্তু পূর্ণলক্ষ্মী আসে না, তার মা শ্রীমতী সত্যলক্ষ্মী বসাক তাকে ঘরে আটকে রাখে। তারা ভয় পায়, কেন পায় আমরা বুঝি না, তবে মহল্লার লোকেরা বলে যে, ইলেকশন এলে চন্দ্রকান্ত বসাকের সঙ্কট হয়, সত্যলক্ষ্মী ভয় পায়; এবং তারা পূর্ণলক্ষ্মীকে বাড়ি থেকে বের হতে দেয় না। তখন লম্বা সাদা পাঞ্জাবি পরে একদিন আহমদ জুবায়ের মিলন তার দলবল নিয়ে মহল্লার বাড়িতে বাড়িতে যায়, পুরুষদের সঙ্গে কোলাকুলি করে, মহিলাদের সালাম দেয়, এবং আমরা ইন্দুর-বিলাই খেলা পোলাপান তাদের পিছনে পিছনে ঘুরি;

তারপর লম্বা হলুদ পাঞ্জাবি পরে আবুল কালাম আজাদ আসে, আমরা তার পিছনেও যাই।

মহল্লার সব লোকের কাছে, আমাদের এই খেইলের দুই ভাই, মিলন ভাই এবং কালাম ভাই দোয়া চায়, এবং তারা যখন বলে, ভোট দিবার যায়েন কইলাম, তখন মহল্লার লোকেরা তাদেরকে বলে, হঁ যামু, যামু না ক্যালা! রকেট মার্কার প্রার্থী আহমদ জুবায়ের মিলন ভাই চন্দ্রকান্তের বাসায় যায়, তার দুই হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বলে, দাদা, আপনেগো আশির্বাদ সবসময় পাইছি, আবার চাই, বৌদি আপনেগো আশির্বাদ চাই; আপনেগো মার্কা রকেট মার্কা আছিল, আশা করি চিরদিন থাকব; দাদা ভোট দিবার যায়েন কইলাম, ভোট দিবার যায়েন কইলাম বৌদি । তখন চন্দ্রকান্ত বলে, যামু; তখন সত্যলক্ষ্মী বলে, হঁ যামু ভোট দিবার।

তারপর এরোপ্লেন মার্কার আবুল কালাম আজাদ ভাইও আসে, সেও চন্দ্রকান্তের দুই হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে আর ছাড়ে না, ধরে রাখে, বলে, দাদা আপনেগো আশির্বাদ চাই, বৌদি আপনেগো বাইতে আইছি আশির্বাদ চাওনের লাইগা; ভোট দিবার যায়েন কইলাম। তখন চন্দ্রকান্ত এবং সত্যলক্ষ্মী বলে, হঁ, যামু।

মহল্লার লোকেরা বলে যে, নির্বাচনের ফলে চন্দ্রকান্ত এবং সত্যলক্ষ্মীর ঝামেলা বাড়ে; রকেট মার্কার প্রার্থী আহমদ জুবায়ের মিলন জানে যে, চন্দ্রকান্ত এবং সত্যলক্ষ্মী ভোট কেন্দ্রে গেলে রকেট মার্কাতেই ভোট দেবে, সারা জীবন দিয়েছে। এরোপ্লেন মার্কার আবুল কালাম আজাদেরও একই রকম ধারণা, চন্দ্রকান্ত এবং সত্যলক্ষ্মীকে ভোট দিতে যেতে বললেও সে জানে, তারা ভোট কেন্দ্রে গেলে এরোপ্লেন মার্কায় ভোট দেবে না, কোন দিন দেয় নাই। তখন মহল্লার লোকেরা আব্দুল জব্বার ওরফে কান কাটা জব্বার এবং আব্দুল হাকিম ওরফে হাক্কাকে দেখে, নির্বাচনের দুই/এক দিন আগে তারা তাদের সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মহল্লার অলিগলি ঘুরে ভোটের ক্যানভাস করে এবং এক সময় চন্দ্রকান্ত ও সত্যলক্ষ্মীর ৩৫ নম্বর বাড়িতে যায়। প্রথমে আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের পক্ষ থেকে কান কাটা জব্বার আসে, চন্দ্রকান্ত তাকে চেনে, সে তাকে চেয়ার এনে বারান্দায় বসতে দেয়, তখন সে চন্দ্রকান্তকে বলে, দাদা ভোট দিবার যাইবার চান? চন্দ্রকান্ত চুপ করে তাকিয়ে থাকে, আব্দুল জব্বার তার চোখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় যখন বলে, দাদা যাইবেন সেন্টারে? তখন চন্দ্রকান্ত বলে, ঠিক আছে যামু না! তারপর মিলন ভাইয়ের হয়ে কথা বলার জন্য আসে আব্দুল হাকিম ওরফে হাক্কা এবং তার দলবল, চন্দ্রকান্ত তাকেও চেনে, সে তাকেও খাতির যত্ন

করে, তারপর সে যখন বলে, দাদা ভোট দিবার যায়েন কিন্তু, না গেলে কিন্তু গোসা হমু দাদা; তখন সে বলে, আইচ্ছা যামু।

নির্বাচনে এরোপ্লেন মার্কার আবুল কালম আজাদ ভাই জিতে যায় এবং নির্বাচনের পরদিন প্রথমে আব্দুল হাকিম ওরফে হাক্কা আসে, পূর্ণলক্ষ্মী ছুটে গিয়ে খবর দিলে চন্দ্রকান্ত ভেতরের ঘর থেকে বের হয়, হাক্কার চোখ কুঁচকানো, মুখ শুকনা এবং গম্ভীর।

সে বলে, ভোট দিবার যান নাই, খুব খরাপ করছেন।

চন্দ্রকান্ত বলে, না গেছিতো, দিছিতো ভোট! তারপর সে তার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল তুলে ধরে নখের কিনারার চামড়ায় লাগানো অমোচনীয় কালির দাগ দেখায়, আব্দুল হাকিম ওরফে হাক্কা চন্দ্রকান্তের বুড়া আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে যায়।

তখন আব্দুল জব্বার ওরফে কান কাটা জব্বার আসে, পূর্ণলক্ষ্মী ছুটে গিয়ে খবর দিলে এবার সত্যলক্ষ্মী ঘর থেকে বের হয় এবং তাকে দেখে আব্দুল জব্বারের হাসিখুশি মুখ একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে, চোখের কোনা ভাঁজ খায়।

সে বলে, রকেট মার্কায়ই ভোট দিলেন, জিতায়া পারলেন নাতো?

না, দেই নাইতো ভোট, যাই নাইতো! সে তার দুই হাতের দশ আঙ্গুল উঁচা করে ধরে, আব্দুল জব্বার ওরফে কান কাটা জব্বার দেখে এবং ভাবে, তারপর সত্যলক্ষ্মীর আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থেকে চলে যায়।

কিন্তু মহল্লার লোকেরা বলে যে, হাক্কা এবং কান কাটা জব্বারের সন্দেহ যায় না, তারা আবার আসে। এবার আব্দুল জব্বার আগে আসে, পূর্ণলক্ষ্মী ভেতরে গিয়ে খবর দিলে সত্যলক্ষ্মী বের হয়, এবং আব্দুল জব্বার যখন জিগায়, দাদায় কই, হ্যারে ডাকেন, তখন সত্যলক্ষ্মী বলে, হ্যায়তো বাইতে নাইকা, জোড়পুল গেছে। তখন আব্দুল জব্বার তার দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে, হাচা কন?

একটু পরে আব্দুল হাকিম আসে, পুনরায় পূর্ণলক্ষ্মী খবর দিলে বাড়ির ভেতর থেকে চন্দ্রকান্ত বের হয়; তাকে দেখে, আব্দুল হাকিম ওরফে হাক্কা যখন বলে, বৌদিরে দেখি না, তখন চন্দ্রকান্ত বলে, অয়তো ঠাকুঘরে পূজা করে,অখন বাইরইবো না।

তারপর আবার কান কাটা জব্বার আসে, পূর্ণলক্ষ্মী আবার মাকে খবর দেয়, সত্যলক্ষ্মী এসে তাকে বলে, আমরা ভোট দেই নাইকাতো, আমার আঙ্গুল দেখেন। হ্যায়তো বাইতে নাইকা, কই জিনি গেছে।

তারপর আব্দুল হাকিম হাক্কা আসে, পূর্ণলক্ষ্মী আবার দৌড়ায় এবং চন্দ্রকান্ত এসে তাকে বলে, ভোট দিমু না ক্যান! আপনের বৌদি দুপুর বেলা এই একটু ঘুমায়, সারাদিন কাম কইরা কাহিল হয়া যায়তো!

তারা তারপর ঘুরে ঘুরে আসে, ফলে পূর্ণলক্ষ্মীকে পাহারায় থাকতে হয়, সে জহুরার সঙ্গে রান্দা-বাড়া খেলার সময় পায় না। তখন জহুরা একা একা খেলে, কিন্তু তার খেলা জমে না; পরে আমরা, মহল্লার বালকেরা, জহুরাকে আমাদের ইন্দুর-বিলাই খেলায় নিয়ে নেই। তবে তাকে আমরা দুধভাত বানাই, অর্থাৎ সে কখনো ইন্দুর হয় না, আমরা আমাদের মত খেলি, সে আমাদের সঙ্গে এমনি দৌড়াদৌড়ি করে আর খুশি হয়। এভাবে, আমাদের মনে হয় যে, আমাদের জীবন থেকে পূর্ণলক্ষ্মী হারিয়ে যায়, আমরা তার কথা ভুলে যাই।

নমুনা ৭ ঃ বিলাইয়ের নাম ডেঙ্গু ।

তখন মহল্লায় ডেঙ্গু জ্বর দেখা দেয়, আমরা বুঝতে পারি মশা কেমন করে বিলাই হয়ে ওঠে এবং মানুষ তাদের ভয়ে ইন্দুরের মত দৌড়ায়; আমরা জানতে পারি যে, এডিশ মশা থেকে এই ছাতার রোগ হয় এবং এই রোগ হলে পশ্চাৎদেশ দিয়ে রক্ত বের হয়ে লোকে মারা পড়ে। এই খবর শুনে আমাদের মায়েরা আমাদের জন্য খুবই দুশ্চিন্তা করে, তারা আমাদের বলে, সারা দিন ইন্দুর-বিলাই খেলচ, দেখচ না চাইর দিকে কেমুন ডেঙ্গু হয়া মানুষ মরতাছে; কিন্তু আমরা আমাদের মায়েদের এই যুক্তি বুঝতে পারি না যে, ইন্দুর-বিলাই খেলার সঙ্গে ডেঙ্গুর কি সম্পর্ক, ফলে আমরা তাদের পাত্তা দেই না, আমাদের খেলা জারি থাকে। মহল্লায় হঠাৎ করে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ লোকেরা বুঝতে পারে না, কিন্তু শামসুল আলম খানের যখন ডেঙ্গু হয় এবং মহল্লার লোকেরা তা জানতে পারে, তারা বিষয়টা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শামসুল আলমের প্রথমে সাধারণ ডেঙ্গু জ্বর, ডেঙ্গু ক্লাসিক হয়, কয়েক দিনের ভেতর তার এই জ্বর ভাল হয়ে যায়; কিন্তু মহল্লার লোকেরা পরবর্তী সময়ে বলে যে, এর পরেই শুরু হয় খেইল, ডাক্তার তাকে এই কথা বলে দেয় যে, আর একবার যদি মশা তাকে কামড়ায় এবং যদি তার পুনরায় ডেঙ্গু হয় তাহলে এবার তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। ফলে, শামসুল আলম মশার ভয়ে কাবু হয়ে পড়ে, তার ছেলে এবং ছেলের ক্যাডাররা তাকে বাঁচাতে পারে না। সে লোক দিয়ে তার বাড়ির আশপাশের জঙ্গল/গাছপালা কাটায়, পানি জমা নালা নর্দমা পরিষ্কার করায় এবং ঘরে এরোসল স্প্রে করে, কয়েল জ্বালিয়ে দিনেরাত সারাক্ষণ নিজেকে মশারির ভেতর বন্দি করে রাখে। কিন্তু তারপরও মশা তাকে ছাড়ে না, এত কিছুর পরও মশা আসে এবং শামসুল আলমকে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে, হয়তো বাথরুমে যাওয়ার সময় অথবা গোসল করার সময়, অরক্ষিত পেয়ে কামড়ায়, সে জানতেও পারে না। তার এবার কঠিন ডেঙ্গু, ডেঙ্গু হেমারেজিক হয়; তার হঠাৎ প্রবল জ্বর শুরু হয়, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমে চাকা চাকা হয়ে যায়, চোখের সাদা অংশ গাঁজাখোরদের

মত লাল হয়ে ওঠে, তারপর শরীরের বিভিন্ন ছিদ্রপথে তাজা রক্ত গড়ায়; ডক্তাররা তাকে স্যালাইন দেয়, প্লাটিলেট দেয়, কিন্তু তারপরও বাঁচাতে পারে না। আর মহল্লার লোকেরা বুড়া বিহারির দোকানে বসে আরো চা আর নিমকপারা খায় এবং বলে যে, তারতো উপায় ছিল না, কারণ, খতিজা বলেছিল, আল্লায় বিচার করব! তখন আমরা, ইন্দুর-বিলাই খেলাইনা পোলাপান, এই ইন্দুর ইন্দুর, ধর ধর, মার মার, গেল গেল গেল গেল, বলে চিৎকার করতে করতে মহল্লার রাস্তা দিয়ে দৌড়াই।

খেলার শেষ (নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)ঃ

এই খেলার শেষ নাই, খেলোয়াড়ের শেষ আছে; খেলোয়াড় খেলা ছেড়ে যায়, কিন্তু খেইল জারি থাকে। উল্লেখ্য যে, বালকদের খেলা ছাড়া অন্যান্য খেলার ক্ষেত্রে, বিভিন্ন কারণে, যেমনঃ বুইড়া হয়ে গেলে বা মরে গেলে অথবা খেলতে খেলতে ক্লান্ত বা বিরক্ত হয়ে গেলে কিংবা জীবনে হঠাৎ দরবেশি ভাব দেখা দিলে, কেবল বিলাইরা ইচ্ছা করে খেলা ছেড়ে যেতে পারে, ইন্দুররা পারে না; বিলাই খেলতে চাইলে ইন্দুরকে খেলতে হবে।

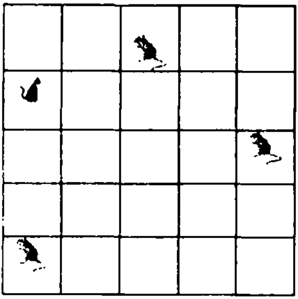

২০০২

# প্রথম বয়ান

আব্দুর রহমানের হয়তো এক শোক হয়। যে ঘটনা ঘটার সময় বোঝা যায় না, পরে বোঝা যায়, তার জন্য শোক করা ছাড়া মানুষের আর গতি কি? ভূতের গলিতে আব্দুর রহমান এই অবস্থায় পড়ে চাপা খায়া থাকে।

সেদিন মাথা ধরা নিয়া শুয়ে থাকার পর তার বৌ ঝর্ণা বেগম মোটা ফরসা আঙ্গুল দিয়া তার কপালের দুই পাশে মলম লাগায়া টিপা দিলে সে তার ভূতের গলির ৩৬ নম্বর বাসা থেকে বের হয়, তখন হয়তো সকাল অথবা বিকাল, অথবা বিকাল গড়ায়া এই হৈচৈ-এ ভরা মহল্লায় একরকমের ধুলাধুলা নীরবতাসহ সন্ধ্যা আসি আসি করে; হয়তো বড় রাস্তা থেকে মন্দিরের পাশ দিয়া যে গলি প্যাঁচ খায়া ভিতরে ঢুকে গেছে সেই রাস্তার কোনায়, সাদমন আলি কন্ট্রাক্টারের বাড়ির সামনের ইলেক্ট্রিকের লোহার খাম্বার মাথায় কাকের বাসার মতন জড়াইনা প্যাঁচইনা তারের জটের নিচে ঝুলে থাকা ষাইট অথবা একশ ওয়াটের টিমটিমা একটা বাত্তি জ্বলে উঠেছে অথবা উঠব উঠব করছে। তখন আব্দুর রহমান তার বাসা থেকে বের হয়া গলির মাথায় রাস্তার কোনায় যায়া খাড়ায়; খাড়ায়া খাড়ায়া সে কি দেখে বলা যায় না, হয়তো কিছু দেখে, হয়তো কিছুই দেখে না, এমনি খাড়ায়া থাকে। তারপর সে হয়তো একটু ক্লান্ত হয়, তার পা একটু ভার হয়া আসে, তখন সে পা বদলায়া শরীরের ভর অন্য পায়ের উপরে নেয়, বাম হাত উঁচা করে ইলেক্ট্রিকের খাম্বার গায়ে ঠেস দেয়। তখন তার আঙ্গুলে নরম কেদোর মত কিছু একটা লেগে যায় এবং তার মনে হয় যে, হয়তো কাকের গু! সে মন্দিরের বারান্দার কোনায় আলগা ইটা গেঁথে বানানো খুপড়ির মত দোকানের পান বিড়ি সিগারেটের ভাড়াইটা দোকানদার ইদ্রিস আলিকে বলে, ইদ্রিস, হাতে কাউয়ার গু লাগলো মনে লয়!

ইদ্রিস আলি বলে, কাউয়ার গু কৈ পাইলেন!

তারপর তারা দুই জনেই বিষয়টা নিয়া কিছুক্ষণ বিভ্রান্ত হয়া থাকে এবং তখন ইদ্রিস আলি বলে, হুইঙ্গা দেখেন, কাউয়ার গু হইলে কড়া গন্দ পাইবেন।

আব্দুর রহমান তার বাম হাতের আঙ্গুল নাকের কাছে এনে শুঁকে দেখে, তার মনে হয় যে, কোন গন্ধ নাই; সে বলে, না গন্ধ নাইকা!

এই সময় হয়তো ইদ্রিসের দোকানে খরিদ্দারের ভিড় ছিল না, সে আব্দুর রহমানের সঙ্গে উৎসাহী হয়া কথাবার্তা চালায়, বলে, তাইলে আপনের হাতে কিছু লাগে নাইকা, আপনে হুদাহুদি কন।

ইদ্রিস আলির এই কথায় আব্দুর রহমানের হয়তো সন্দেহ হয়, সে তার বাম হাতের আঙ্গুলগুলা আবার নাড়াচাড়া করে দেখে যে, না, ঠিকই আঠাআঠা লাগে, কিছু একটা লাগছে, খাম্বার গায়ে কিছু একটা লাগান ছিল; এবং সে বলে, না ইদ্রিস, কিছু একটা লাগছে।

তখন, এতক্ষণ পর ইদ্রিস যে কথা বলে তা শুনে মনে হয় যে, সে আগেই জানতো আব্দুর রহমানের আঙ্গুলে কি লাগছে, সে বলে, আপনের হাতে চুনা লাগছে, কেউ পান খায়া খাম্বার লগে হাত মুইছা থুয়্যা গেছে, হুইঙ্গা দেখেন, চুনার গন্দ পান না?

আব্দুর রহমান বলে, হঁ, পাইতো!

তখন ইদ্রিস আলি বলে, আপনের আঙ্গুলে চুনাই লাগছে।

তার কথা শুনে আব্দুর রহমান এবার নিশ্চিত হয় এবং বলে, হঁ, চুনাই।

ইদ্রিসের হয়তো সারা বেলা ধরে দোকানদারি করে বিরক্ত লাগে, তার আরো গল্প করতে মন চায়, সে আব্দুর রহমানকে কাছে ডাকে, বলে, খাড়ায়া না থাইকা, আয়া টুলে বহেন না ক্যালা?

আব্দুর রহমানের হয়তো বসার ইচ্ছা ছিল না, হয়তো খাম্বা ধরে খাড়ায়া থাকার জন্যই সে বাড়ি থেকে বের হয়; কিন্তু আঙ্গুলে কাকের গু অথবা পানের চুনা লেগে যাওয়ার পর ইদ্রিস যখন তাকে ডাকে তখন তার হয়তো মনে হয়, যাই, যায়া ইকটু বহি; এবং সে ইদ্রিসের কোমর সমান উঁচা দোকানের সামনে রাখা কাঠের টুলে যায়া বসে।

ইদ্রিস বলে, পান দেই এউকগা?

কিন্তু ইদ্রিস সত্যি তাকে মাঙনা পান খাওয়াতে চায় কিনা সে ব্যাপারে আব্দুর রহমান নিশ্চিত হতে পারে না; সে বলে, পান খামু না, আমারে একটা পানের বোঁটা দেও, খাই।

পানের বোঁটা খাওয়ার বিষয়টা হয়তো ইদ্রিসের ভাল লাগে না, তখন আব্দুর রহমান তাকে গলা নরম করে সব বুঝায়া বলে, সে বলে যে, পানের বোঁটা চাবায়া খাওয়ার মজা অন্য রকম, দেও একটা খাই!

ইদ্রিস আলি তখন হয়তো তার কথা বিশ্বাস করে যে, পানের বোঁটা চাবায়া খাওয়া সত্যি আনন্দের, অথবা করে না; তবে সে আব্দুর রহমানকে দুইটা বোঁটা ভেঙ্গে দেয়। আব্দুর রহমান তার এক ঠ্যাংয়ের উপরে আর এক ঠ্যাং চেপে ধরে বসে পানের বোঁটা চাবায়া খায়, তার মুখের ভিতরে ছোবড়া ছোবড়া ঝাল ঝাল লাগে, তালু আর জিব জ্বলে; সে বলে, এই ইলেকট্রিকের খাম্বার লগে তুমার খরিদ্দাররা মিয়া পানের চুনা মুইছা থুয়্যা যায়, আর আমি মনে করি যে, কাকের গু!

তখন তার পুরান কথা মনে আসে, সে নিশ্চিত হয় যে, এইখানে একদিন কোন ইলেট্রিকের খাম্বাই ছিল না; এবং সে ইদ্রিসকে বলে, এইখানে কাচের বাক্সের ভিতরে হেরিকেনের একটা বাত্তি আছিল, একটা কাঠের লম্বা খুঁটার মাথায় জ্বলতো; এইখানেই আছিল, কিম্বা হয়তো এইখানে আছিল না,- হয়তো আবুল হোসেন কয়া পারব কই আছিল বাত্তিটা,- হয়তো মামুনগো বাড়ির সামনে আছিল।

তারপর, সেদিন, অথবা তার পরদিন অথবা অন্য কোন একদিন ইদ্রিস আলির দোকানে হয়তো বাবুল মিঞা কিংবা আলমগির অথবা ফখরুল 'আলম ওরফে লেদু যায়া খাড়ায়া খাড়ায়া গল্প করে, হয়তো তারা পান বিড়ি সিগারেট খায় অথবা কিছুই খায় না, হয়তো তারাও পানের বোঁটা ভেঙ্গে চাবায়। তখন হয়তো ইদ্রিস আলি আব্দুর রহমানের কথা বলে, সে বলে যে, আব্দুর রহমান রাস্তার কিনারার কেরাসিন বাত্তির গল্প করে; এবং তখন বোঝা যায় যে, রাস্তার এই কেরাসিনের বাত্তি আব্দুর রহমানের কাছে একটা প্রসঙ্গ বটে।

আব্দুর রহমানের আবার যেদিন মাথা ধরে এবং তার স্ত্রী , ঝর্ণা বেগম, তার মাথায় ভিকস মালিশ করে যখন বলে, আপনের এত মাতা ধরে ক্যালা? তখন আব্দুর রহমান বলে, ধরলে কি করুম!

ঝর্ণা বেগম বুঝতে পারে না কি করার আছে, সে বলে, আপনে নিকি রাস্তার কেরাসিন বাত্তির খাম্বা বিচরান?

- কে কইলো?
- হুনলাম।
- কি হুনলা?
- খুঁটার মাথায় বাত্তি জ্বলতো, আর আপনে অখনে কইতে পারেন না কই জ্বলতো, হুদাহুদি বিচরান!
- মাইনষে খালি আজাইরা কথা কয়!

তখন ঝর্ণা বেগম হয়তো আব্দুর রহমানের মাথা ধরার সঙ্গে বাত্তির বিষয়টা মিলায়া ফেলে; তার হয়তো মনে হয় যে, যা নাই, তা খুঁজে পাওয়া না গেলে মাথা ধরতেই পারে এবং সে বলে, আপনে আবুল ভাইরে যায়া জিগান না ক্যালা!

- কি জিগামু? খুঁটার উপরে বাত্তি কই জ্বলতো?

হঁ, ক্যালা, জিগাইলে কি হয়?
পাগল-ছাগল কইব আমারে!

মহল্লার লোকেরা বলে যে, তবুও ঝর্ণা বেগমের কথাটা আব্দুর রহমানের মনে ধরে, যদিও আবুল হোসেন মিঞাকে বিষয়টা বোঝাতে তার কষ্ট হয়। এমনিতেই বিষয়টা গোলমেলে, বুঝে ওঠা মুশকিল যে, চল্লিশ বছর আগে রাস্তার কিনারার একটা কেরাসিনের বাত্তি কোন জায়গায় ছিল তা খুঁজে বের করা কেন দরকার। তার উপর আবুল হোসেন অনেক কাজের লোক, তার ব্যস্ততার শেষ নাই; সে আব্দুর রহমানের মত সকাল-বিকাল চাকরি করা লোক না, এইসব ভাবগত বিষয় বোঝার চেষ্টা করার মত সময় তার নাই। ফলে, কয়েক দিন চেষ্টা করার পর যখন কাজ হয় না, তখন কোন একদিন, হয়তো ৩য় অথবা ৪র্থ দিন আব্দুর রহমান হাল ছেড়ে দিয়া বলে, চলো এমনেই খুঁইজা দেখি!

সেদিন, কি মনে করে আবুল হোসেন রাজি হয়; আবুল হোসেনের হয়তো অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে এবং বুঝতে পারে আব্দুর রহমান কেন এই বাত্তি নিয়া এমন পীড়াপীড়ি করে, অথবা তার হয়তো কিছুই মনে পড়ে না। তবু পরবর্তী শুক্রবার সকালে জুম্মার নামাজের আগে আব্দুর রহমানের সঙ্গে যখন আবুল হোসেনকে মন্দিরের পাশের গলির ভিতর দিয়া হাঁটাহাঁটি করতে দেখা যায়, তখন পান বিড়ি দোকানদার ইদ্রিস আলির দোকানে হয়তো বাবুল মিঞা কিংবা ফখরুল আলম ওরফে লেদু আসে। তারা হয়তো পান সিগারেট কিনতে কিংবা গল্প করতে আসে, অথবা তারা হয়তো চান্দাবাজি করে; এবং ইদ্রিস আলির যেহেতু তাদের কিছু বলার সাহস হয় না সে আব্দুর রহমানকেই বরং একটা গাল দেয়, বলে, হালায় বাত্তির খাম্বা বিচরায়!

প্রথম দিন আবুল হোসেনের হয়তো মনে হয় যে, বিষয়টা খুব সোজা, অথবা খুব সোজা না হলেও তেমন কঠিন না; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, সময়ের এই দূরত্বে খাড়ায়া কাজটা কঠিন-ই, ফলে তারা দুইজন ভুল কথা বলে পরস্পরকে বিভ্রান্ত করে এবং তখন মসজিদ থেকে মাইকে আজানের শব্দ ভেসে আসে এবং তারা জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য বাসার দিকে যায়।

তবে, দ্বিতীয় শুক্রবারে আবুল হোসেন নিশ্চিত হয় যে, আসলে কেরাসিন বাত্তির কাঠের এই খুঁটিটা মন্দিরের গলির মুখে, যেখানে সাদমন আলি ঠিকাদারের বাসা, তার সামনে কোনার মধ্যেই ছিল; কিন্তু তখন আব্দুর রহমান বহুদিন পূর্বে মন্দিরের বারান্দায় তাদের দুইজনের বসে থাকার গল্পটা বলে, হয়তো পুরাটা বলে না, কারণ পুরাটা হয়তো তার স্মরণ নাই; সে হয়তো ইকটুখানি বলে, যা শুনে আবুল হোসেনের নিশ্চিত হিসাব কেমন নড়বড় করে। আব্দুর রহমানের গল্পটা আবুল হোসেনেরও হয়তো ভাল মনে ছিল না, ফলে সে বিভ্রান্ত হয়; এবং মহল্লার

লোকেরা যখন বলে, আব্দুর রহমান মিঞা আদতে কি বিচরায়? - তখন মনে হয় যে, আব্দুর রহমান হয়তো অন্য কিছু খোঁজে!

রাস্তার কিনারার কেরাসিন বাত্তির বিষয়ে আবুল হোসেনকে যখন আব্দুর রহমান বলে যে, একদিন তারা দুইজন রাস্তার কিনারায় মন্দিরের সামনের বারান্দার উপর বসে ছিল, - তখন বোঝাই যায় যে, এটা একটা গল্প, যে গল্প আবুল হোসেনেরও জানার কথা, যদিও সে হয়তো তা মনে করতে পারে না। ভূতের গলির লোকেরা যখন এইসব বলে, তখন কেরাসিনের বাত্তির গল্পের সঙ্গে সুপিয়া আকতার এবং চম্পা ফুল গাছের ভাঙ্গা একটা ডালের কথা প্যাঁচ খায়া জড়ায়া যায়; তবে আব্দুর রহমান মনে হয় দীর্ঘদিন এই গল্প সম্পর্কে বেখেয়াল হয়া থাকে। অনেক দিন পরে একাত্তর সনে জিঞ্জিরায় পালায়া যাওয়ার পর চরাইল গ্রামে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় নিয়া থাকার সময় সুপিয়া আকতারের সঙ্গে তার আবার দেখা হয়; তবে সুপিয়াকে দেখে হয়তো তার কিছু মনে হয় না, কারণ তার এমনই স্বভাব, বেহুঁশ হয়া থাকে! কিন্তু তারপর সুপিয়ার সঙ্গে যখন তার কথা হয় তখন এতদিন পর তার হয়তো সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে, এবং মহল্লার লোকেরা নিশ্চিত হয় যে, জিঞ্জিরায় সুপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের এই দিন আব্দুর রহমানের এই দুঃখ অথবা শোকের জন্ম হয়!

জিঞ্জিরায় দেখা হওয়ার অনেকদিন আগে সেই ঘটনা পরপর ৩ দিন ঘটে, কিন্তু সে, আব্দুর রহমান, তখন তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না! সুপিয়ারা ভূতের গলির একটা শাখা গলির ভিতরে হুমায়ুনদের বাসার ভাড়াইটা ছিল, তখন একদিন সুপিয়া আকতার যেন কোথায় গেছিল, গেলে ফিরা আসতে হয়, তাই কোথেকে যেন সে ফিরা আসে; তার পরনে বোধহয় শাড়ি অথবা হয়তো সালোয়ার কামিজই ছিল, সঙ্গে যেন কে, হয়তো তার আম্মা, না হয় দাদি আম্মা। তারা সেই বিকাল বেলা জোড়পুলের দিক থেকে মহল্লার ভিতর দিয়া হেঁটে আসে এবং তাদের হাতে, হয়তো সুপিয়ার হাতে কিংবা তার মা অথবা দাদির হাতে চম্পা ফুল গাছের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখা যায়। কোথেকে তারা এই ফুল গাছের ডাল ভেঙ্গে আনে তা বোঝা যায় না, তবে মনে হয় যে, তারা হয়তো কোথাও এই চম্পা ফুল গাছ দেখতে পায় এবং তাদের হয়তো শখ হয়, হয়তো সুপিয়ার-ই শখ হয়, হয়তো সে গোঁ ধরে, বলে, একটা ঠাইলা ভাইঙ্গা লই?

চম্পা গাছটা হয়তো উঁচা ছিল, ফলে এই তিনজন অথবা দুইজন নারীর পক্ষে গাছের ডাল ভাঙ্গা সহজ হয় না; কিন্তু সুপিয়াতো নাছোরবান্দা মেয়ে, তখন হয়তো সেই বাড়ির ভিতর থেকে মোচদাড়িওয়ালা বড়সড় একটা ছেলে বের হয়া আসে, সে হয়তো সলিমুল্লাহ কিংবা জগন্নাথ কলেজে আইএ কিংবা বিএ পড়ে অথবা হয়তো কিছুই পড়ে না, হয়তো দোলাই খালের লোহালক্কড়ের দোকান চালায়;

তার নাম হয়তো আব্দুর রশিদ কিংবা আব্দুল জব্বার কিংবা নজরুল ইসলাম। তাকে দেখে সুপিয়া লাফ পাড়ে; তার আম্মা কিংবা দাদি তাকে ধমকায়, কিন্তু সে শোনে না; তখন হয়তো এই ছেলে অথবা যুবক চম্পা ফুল গাছের একটা ডাল ভেঙ্গে সুপিয়ার হাতে দেয়। তারা যখন ফুল গাছের এই ডাল পদ্মনিধি লেন অথবা বনগ্রাম কিংবা আরো দূরে হয়তো বংশালের কোন বাসা থেকে ভেঙ্গে আনে, তখন মনে হয় বর্ষাকাল এবং চম্পা ফুল ফোটার সময় ছিল, কারণ, সুপিয়ার হাতের সবুজ পাতায় সমৃদ্ধ লম্বা ডালটায় চম্পা অথবা ঘিয়া রঙের এক ফুল দেখা যায়। এই সময়, গ্রাজুয়েট হাই স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্র, আব্দুর রহমান লুঙ্গির উপরে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে তার ছেলেবেলার প্রিয় বন্ধু আবুল হোসেনের সঙ্গে মন্দিরের নিচা বারান্দায় বসে ছিল; তখন সুপিয়া এবং বোরকা পরা তার আম্মা অথবা দাদি হেঁটে আসে। এতদূর থেকে এই ডাল বয়া আনতে যায়া হয়তো সুপিয়ার শেষমেষ বাড়ির কাছে এসে কাহিল লাগে, একটা মেয়ের কাহিল লাগতে পারে, ফুলের ডালটা হয়তো ভার মনে হয়, ফলে সে- অথবা হয়তো তার কাহিল লাগে না, কারণ চম্পা ফুলের একটা চিকন ডাল এবং কয়টা পাতা আর ফুল এমন কি ভারি, তবু সে- আব্দুর রহমান এবং আবুল হোসেনের সামনে দিয়া হেঁটে পার হয়া যাওয়ার সময় ডালটা আব্দুর রহমানের কোলের উপর ফালায়া দেয়; এই কাজটা সে তার আম্মা এবং দাদির সামনে এমনভাবে করে যে, মনে হয় সে ডালটা রাস্তার কিনারায় ফালায়া দিল মাত্র, আর কিছু না। হয়তো আর কিছু ছিলও না, অথবা হয়তো ছিল, তবু ফুলসহ চম্পা ফুল গাছের ডালটা যখন আব্দুর রহমানের অথবা আবুল হোসেনের, মনে হয় আব্দুর রহমানের-ই, কোলের মধ্যে যায়া পড়ে, তখন আব্দুর রহমান সেটা ডান হাতে নিয়া চোখের সামনে উঁচা করে ধরে।

এই সময় সেই বাত্তিওয়ালা লোকটা আসে। সে দক্ষিণ মৈশুন্দির দিক থেকে প্রতিদিনের মত ঘাড়ের উপরে একটা ছোট সাইজের চঙ্গো, আর ডান হাতে লম্বা নল এবং হাতলওয়ালা টিনের কালো নোংরা তেলের পাত্র নিয়া হেঁটে আসে; তার মুখে তখন বিকাল অথবা সন্ধ্যা বেলার পশ্চিম আকাশের আলো পড়ে। আব্দুর রহমানের জানা ছিল যে, লোকটা হেঁটে এসে খাম্বার উপরের দিকে আড়াআড়িভাবে লাগানো কাঠের টুকরার সঙ্গে চঙ্গোটা ঠেস দিয়া রেখে বায়া উঠবে, খুঁটার মাথায় বসানো চোঙ্গার মত কাচের বাক্সের পাল্লা খুলে প্রথমে কাচের ঘেরের চার দিক থেকে গামছা দিয়া মুছে, হারিকেনে তেল ভরে জ্বালাবে, তারপর পাল্লা বন্ধ করে সাবধানে পা টিপা নেমে চলে যাবে। আব্দুর রহমানের এইসব দেখতে ভাল লাগতে পারে, কারণ, বালকদের এমন হয়; ফলে বাত্তিওয়ালা লোকটা যখন আসে আব্দুর রহমান উঠে গিয়ে তাকায়া থাকে। আর তখন সে মন্দিরের বারান্দার উপরে সুপিয়া আকতারের ফেলে যাওয়া চম্পা ফুলের

ডালটা রেখে আসে; কিন্তু বাত্তিওয়ালা, হয়তো তার একটা নাম ছিল, হয়তো ময়না মিঞা, হয়তো হরিধন, সে বাত্তি জ্বালায়া চলে যাওয়ার পর আব্দুর রহমান যখন মন্দিরের বারান্দায় আগের জায়গায় ফেরে, সে দেখে যে, সেখানে আবুল হোসেন নাই, চম্পা ফুলের ডালটাও নাই। তখন হয়তো তার একবার মনে হয় যে, চম্পা ফুলের ডালটা আবুল হোসেন নিয়া গেছে, অথবা তার হয়তো কিছুই মনে হয় না।

ইদ্রিস আলি এবং মহল্লার অন্য লোকেরা হয়তো এই গল্পের কথা শোনে, হয়তো আব্দুর রহমানই বলে, অথবা হয়তো আবুল হোসেন বলে কোন একদিন, এবং তখন তারা হয়তো আব্দুর রহমানের দুর্ভাগ্যের দিকটা খেয়াল করে; ভাগ্য তাকে ৩ বার সুযোগ দেয়, কিন্তু আব্দুর রহমান সৌভাগ্যের ভিতর থেকে দুর্ভাগ্যকে পৃথক করতে পারে না।

সেই ঘটনা ৩ দিন ধরে ঘটে, সুপিয়া আকতারের নানির হয়তো অসুখ হয়েছিল, বুড়া মানুষের অসুখ হতেই পারে, এবং তখন সে তার আম্মা এবং দাদির সঙ্গে মালিটোলা অথবা বেগম বাজারে তার নানা বাড়িতে যায়। প্রথম দিন যাওয়া অথবা ফিরা আসার পথে সে কোন এক জায়গায় এই চম্পা ফুল গাছটা আবিষ্কার করে, তারপর ফেরার পথে মন্দিরের রোয়াকের উপর আব্দুর রহমান এবং আবুল হোসেনকে পায় এবং তার মাথায় চম্পা ফুলের ডালটা ফালায়া দেওয়ার খেয়াল চাপে। অসুখের খবর পায়া প্রথম দিন মালিটোলা অথবা বেগম বাজার যাওয়ার পর সুপিয়ার আম্মার অথবা তার দাদির হয়তো মনে হয় যে, তার নানির মাজার ব্যথা তেমন কঠিন কোন অসুখ না, ফলে তারা সেদিন ফিরা আসে। কিন্তু ২য় দিন খারাপ খবর আসে, তার নানির পায়ের পাতা ফুলে যায় এবং নামাজ পড়তে তার কষ্ট হয়, তখন সুপিয়া আকতারের আম্মা আবার ছুটে যায়, সঙ্গে সুপিয়া এবং হয়তো তার দাদিও থাকে। বোঝা যায় যে, ফেরার পথে তারা পুনরায় একই পথ দিয়া ফেরে, ফলে লালচান মকিম লেন, জোড়পুলের পানির ট্যাংকির গলি কিংবা পদ্মনিধি লেন অথবা অন্য কোথাও সুপিয়া আকতার সেই চম্পা ফুল গাছটা দেখতে পায়; সে তার নানির অসুখের কথা ভুলে যায় এবং এই গাছের ডাল ভাঙ্গার জন্য লাফ পাড়ে, তখন মোচওয়ালা যুবকটা বাসা থেকে বের হয়া তাকে আর একটা ফুলের ডাল ভেঙ্গে দেয়। সে তখন ডালটা বয়া নিয়া আসে এবং আশ্চার্যের ব্যাপার যে, এই বিকাল অথবা সন্ধ্যায় মন্দিরের বারান্দার কিনারায় আব্দুর রহমান এবং আবুল হোসেনকে পুনরায় পা ঝুলায়া বসা অবস্থায় দেখা যায় এবং সে তখন ফুলের ডালটা আব্দুর রহমানের কোলের মধ্যে ফালায়া দেয়। আব্দুর রহমান ডালটা উঠায়া একবার দেখে, কিন্তু তখন এই সন্ধ্যার সময় বাঁশের চঙ্গো কান্ধে নিয়া বাত্তিওয়ালা আসে; ফলে আব্দুর রহমান চম্পা ফুলের ডালটা

বারান্দার উপর রেখে বাত্তি জ্বালানো দেখতে যায় এবং পরে ফিরে এসে দেখে যে, আবুল হোসেন এবং চম্পা ফুলের ডাল, কেউ নাই কিছু নাই। তারপরও সৌভাগ্য আব্দুর রহমানকে আর একটা সুযোগ দেয়, যদিও তাতে কোন লাভ হয় না; সুপিয়া আকতারের নানির অসুখ হওয়ার পর ৩য় দিন আরও খারাপ খবর আসে, তার নানির বিছানা থেকে উঠতে কষ্ট হতে থাকে, খবর পেয়ে সুপিয়ার আম্মা আবার হয়তো বেগম বাজার অথবা মালিটোলায় যায়, সঙ্গে থাকে সুপিয়া এবং হয়তোবা তার দাদিও। যেহেতু এ ধরনের যাতায়াত মানুষ যখন করে তখন তারা প্রতিদিন একই রাস্তা দিয়াই যায়, একই রাস্তা দিয়া ফেরে, খামাখা ঘুরায়া প্যাঁচায়া নতুন রাস্তা বের করে না, ফলে ফেরার পথে সুপিয়া পুনরায় চম্পা ফুলের গাছটা পায় এবং মোচওয়ালা যুবক একটা ডাল তাকে ভেঙ্গে দেয়। সুপিয়া হয়তো ৩য় বারের মত ফিরা আসে এবং দেখে যে, মন্দিরের বারান্দায় আব্দুর রহমান পা ঝুলায়া ঠিক বসে আছে; ফলে সে হাত বাড়ায়া চম্পা ফুলের ডালটা রাস্তার পাশে ফালায়া দেয় এবং সেটা আব্দুর রহমানেরই কোলের উপর যায়া পড়ে। আব্দুর রহমান ৩য় বারের মত ফুলের ডালটা কুড়ায়া নিয়া একবার দেখে, এবং ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, দিনের এই সময়টাই হয়তো প্রতারক ছিল; কারণ, তখন আবার বাত্তিওয়ালা ব্যাটা মান্দারপোলা কান্ধে চঙ্গো ফালায়া হেঁটে আসে এবং সে, আব্দুর রহমান, বাত্তি জ্বালানো দেখার জন্য উঠে যায়, খেয়াল করে না যে, চম্পা ফুলের ডালটা ফালায়া দেওয়ার পর সুপিয়া একটু খাড়ায়া থাকে। এভাবে, দান দান তিন দান হয়ে যাওয়ার পর সুপিয়াকে আর দেখা যায় না; তারপর একদিন সুপিয়ারা হয়তো হুমায়ুনদের বাসা ছেড়ে দিয়ে যায়। এর পর সুপিয়া আকতারের কথা আব্দুর রহমানের হয়তো মনে থাকে না, এত বেখেয়াল লোকের পক্ষে এটা খুবই সম্ভব, তবে একাত্তর সনের মার্চ মাসের শেষ অথবা এপ্রিল এর প্রথমে জিঞ্জিরায় পালায়া আশ্রয় নিলে সুপিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় এবং সে ৩য় দিনের পরের ঘটনা জানতে পারে।

নয়াবাজারের আগুন আর প্রতি রাতের গোলাগুলিতে ভয় পায়া সে তার মা এবং ছোট তিন ভাইবোনকে নিয়া জিঞ্জিরায় চরাইল গ্রামে যায়া আশ্রয় নেয় এবং সুপিয়া একটু পরে তাকে সব কথা খুলে বলে। জিঞ্জিরায় সুপিয়া বলে যে, তার নানির অবস্থা ৪র্থ দিন আরো খারাপ হয়, তার পেশাব বন্ধ হয়ে যায় এবং সে নিজের অবস্থা বুঝতে পারে, বলে, এ্যালা যামু! এই খবর পাওয়ার পর সুপিয়ার আম্মা আবার মালিটোলা অথবা বেগম বাজার, হয়তো মালিটোলায়ই, দৌড়ায়, সঙ্গে সুপিয়া এবং হয়তো তার দাদিও যায়। কিন্তু এইবার তারা আর বিকাল বেলা ফিরা আসে না, হয়তো তার দাদি একলা ফিরা আসে; বস্তুত, সুপিয়া আর কোন দিনই ভূতের গলিতে ফেরে না। লালচান মকিম লেন, জোড় পুল, পদ্মনিধি লেন

অথবা অন্য কোন এক গলির ভিতর মোচওয়ালা এক লোক সুপিয়া আকতারকে চম্পা ফুলের ডাল ভেঙ্গে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করে, কিন্তু সুপিয়া আসে না; তার পরদিনও সে অপেক্ষা করে, কিন্তু সুপিয়ার দেখা নাই। তখন হয়তো পুরানা লোহালক্কড়ের দোকানদার সেই যুবক সুপিয়ার খোঁজে বের হয়, সে কোথায় কোথায় খোঁজে এবং অতঃপর সুপিয়াকে পায়। সুপিয়া তখন নানার বাড়িতে তার আম্মাকে নিয়া থাকে; নানির মৃত্যুর পর তার নানার পরিবারে এটা ছিল শোকের সময়, তখন একদিন এই লোক যায়া খাড়ায় এবং শোকের ভিতরে, সুপিয়ার নানির চেহেলামের পরেই তাকে বিয়া করে নিয়া যায়। জিঞ্জিরায় এই গল্প শুনে আব্দুর রহমানের বিশ্বাস হয় না; তার মনে হয় যে, কিছুই না জেনে লোকটা কেমন করে সুপিয়ার নানার বাস খুঁজে পেল, এটা কি সম্ভব? এবং তাই সে যখন বলে, বিচরায়া পাইলো কেমনে? তখন সুপিয়া বলে, চাইলে পাইব না ক্যান!

তখন আব্দুর রহমানের কিছু বলার থাকে না, সে জানে, না চাইলে আলকাতরাও মেলে না, আর সুপিয়াতো সুপিয়া!

ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, জিঞ্জিরায় চরাইল গ্রামে ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যানের বাড়ির বারান্দায় অন্ধকারের ভিতর খাড়ায়া সুপিয়ার সঙ্গে আব্দুর রহমানের এই আলাপ হয়। জিঞ্জিরায় একাত্তর সনের এপ্রিল মাসের ১ম শুক্রবার সকালে পাকিস্তানি মিলিটরির তাড়া খায়া ধান ক্ষেতের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করার পর চেয়ারম্যানের বাড়িতে তারা সকলে যখন আবার ফিরা আসে তখন আব্দুর রহমান সুপিয়াকে একই বাড়িতে ভিড়ের ভিতর আবিষ্কার করে। মোচওয়ালা আব্দুর রশিদ, আব্দুল জব্বার অথবা নজরুল ইসলাম, তার বুড়া মা, কিশোরী এক বোন, দুইটা গুড়াগাড়া বাচ্চা এবং স্ত্রীসহ এখানে আশ্রয় নেয়। তখন হয়তো সুপিয়ার স্বামীর সঙ্গে আব্দুর রহমানের দেখা হয় অথবা হয়তো হয় না, তবে সেদিন রাতে বাড়ি ভরতি লোকের মধ্যে অন্ধকারের ভিতর কোন এক বারান্দায় খাড়ায়া সুপিয়ার সঙ্গে সে কথা বলে। সুপিয়া হয়তো অন্ধকারের দিকে তাকায়া এমনভাবে নিচা স্বরে কথা বলে যে, শুনলে মনে হবে সে অন্ধকারের সঙ্গেই বিড়বিড়ায়; তারপর সে যখন বলে, আপনে অখনো খাড়ায়া খাড়ায়া রাস্তার বাত্তি জ্বালাইনা দেখেন? তখন মনে হয় যেন আব্দুর রহমান তার কথা বুঝতে পারে না, সে বলে, হঁ, না, ক্যালা?

তারপর চম্পা ফুলের প্রসঙ্গ আসে, এটা অবধারিতই ছিল; প্রথমে হয়তো সুপিয়া এ বিষয়ে কিছু বলে, অথবা হয়তো বলে আব্দুর রহমানই। আব্দুর রহমান চাপা দেয়া সময়ের তলা থেকে স্মৃতির টুকরা তুলে এনে আলাপের পরম্পরা তৈরি করে, বলে, তুমি প্রত্যেক দিন চম্পা ফুলের ঠাইলা কইথন ভাইঙ্গা আনতা?

কিন্তু তখন সে বুঝতে পারে যে, সময় চলে গেছে দূরে, যেমন পানিতে খড়কুটা যায়; কারণ, সেদিন সকাল বেলা পাকিস্তানি মিলিটারির ধাওয়া খাওয়ায় ক্লান্ত এবং জানের ভয়ে মুখ শুকনা করে রাখা সুপিয়া আব্দুর রহমানের কথা শুনে বলে, ফুলের কথা মনে নাইকা আমার!

তখন আব্দুর রহমানের মনে হয়তো দুঃখ জেগে ওঠে, অধিকারের ভেতরকার পাকা আম পচে গেলে যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখ, সেই শোক।

সেদিন সুপিয়া তাকে বলে যে, তারপর তার নানি মরে গেলে আর কিছুই করার থাকে না, আর মোচওয়ালাও তাকে খুঁজে বের করে; ফলে নানি মরার শোক কাটার আগেই ভাল ছেলে পাওয়ায় তার পরিবার নানা বাড়িতেই তার বিয়া দিয়া দেয়। তারপর, জিঞ্জিরায় সেদিন রাতে আব্দুর রহমান অন্তরে বিষণ্ণতার অবসাদ নিয়া ঘুমায়, তার পরদিন তারা সবাই যে যার মহল্লায় ফেরে এবং আব্দুর রহমান দেশ স্বাধীন হয়া গেলে দ্রুত ঝর্ণা বেগমকে বিয়া করে। কিন্তু ভূতের গলির লোকেরা বলে যে, স্মৃতি হচ্ছে কম্বলের মতন, ছাড়ে না, এবং তার এই শোকও যায় না। ঝর্ণা বেগম হয়তো সব জানে কিন্তু কিছু করতে পারে না, কারণ এত দূরবর্তী ও অস্পষ্ট একটা ঝামেলা নিয়া কি করার থাকে তা হয়তো সে বুঝতে পারে না; অথবা হয়তো মোটা মহিলা বলে তার অধিক বাৎসল্য হয়, ফলে বহুদিন পূর্বেকার কিশোর আব্দুর রহমানের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এবং মাথা ধরার ঘটনা যখন ঘটে সে ভিকস মালিশ করে দিতে দিতে আব্দুর রহমানের মাথাটা টেনে নিয়া তার বিপুল বুকের মাঝখানে চেপে রাখে; হয়তো কখনো বলে, সেই বাত্তিওয়ালা লোকটা কি অখনো আছে, না মইরা গেছে গা?

আব্দুর রহমান হয়তো ঝর্ণা বেগমের কথা শোনে অথবা শোনে না, তখন ঝর্ণা বেগম তার গোল ফুলাফুলা নরম আঙ্গুল দিয়া টিপা স্মৃতির বিষ নামানোর পর আব্দুর রহমান হয়তো বাসা থেকে বের হয়া রাস্তার কিনারায় যায়া খাড়ায়। তার মাথার উপরে রাস্তার কোনায় ইলেক্ট্রিকের লোহার খাম্বার মাথার ন্যাড়া বাল্বটা হলুদ রঙের ঘোলা আলো ছড়ায়; সে খাড়ায়া খাড়ায়া দেখে যে, ইদ্রিস দোকানদারি করে, অথবা সে হয়তো কিছু দেখে না, এমনি দাঁড়ায়া থাকে। তখন হয়তো তার পা আবার ভার হয়া আসে, সে তার বাম হাতটা বাড়ায়া ইলেক্ট্রিকের খাম্বার গায়ে ঠেস দেয় এবং তার হাতের আঙ্গুলে নরম মাটির মত কিছু লেগে যায়; সে ইদ্রিসকে ডেকে বলে, ইদ্রিস হাতে চুনা লাগলো মনে লয়!

কিন্তু ইদ্রিস মনে হয় তার কথা শোনে না, হয়তো সে খরিদ্দার নিয়া ব্যস্ত থাকে, হয়তো ফখরুল কিংবা বাবুল মিঞা পানের ডালার সামনে খাড়ায়া মাসিক চান্দা উঠানোর পর গল্প করে, অথবা হয়তো তখন এরশাদ সাহেবের বাসার কাজের মেয়ে, জ্যোৎস্নার মা মশার কয়েল কিনতে এসে ছলবল করে, আর ইদ্রিস

আলি একটা রঙ্গিণ মাছির মত করুণ হয়া থাকে। আব্দুর রহমান হয়তো ব্যাপারটা বোঝে না, সে দুই একবার ইদ্রিসকে ডাক দেয়, তারপর সে হয়তো খেয়াল করে, তখন সে চুপ করে থাকে এবং হাতের আঙ্গুল নাড়াচাড়া করে। তার আঙ্গুলের আগায় আঠাআঠা লাগে এবং সে নিশ্চিত হয় যে, হাতে চুনাই লাগছে, কারণ, তার স্মরণ হয় যে, ইলেক্ট্রিকের খাম্বার গায়ে চুনাই থাকে, ইদ্রিসের খরিদ্দাররা চুনা মুছে থুয়া যায়; তখন সে ইদ্রিসের দিকে তার হাতটা উঁচা করে ধরে, ভাবে যে, জ্যোৎস্নার মায়ের মাথার উপর দিয়া হয়তো ইদ্রিসের চোখে পড়বে। কিন্তু ইদ্রিসের এদিকে তাকানোর সময় হয় না, সে জ্যোৎস্নার মাকে বলে, অখনেই খুইলা দেইখা লও কুনো ভাঙ্গাভুঙ্গা আছে নিকি, পরে আইসা গ্যাঞ্জাম করবা না!

এরশাদ সাহেবের কাজের মেয়ে হয়তো মোরগ অথবা গ্লোব অথবা অন্য কোন মার্কার, সবুজ কিংবা লাল রঙের কয়েলের প্যাকেট খুলে নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করার নামে সময় পার করে,- চোখের কাছে উঠায়া দেখে, একবার চিৎ করে একবার উপুর করে। তারপর, তবুও তাকে যেতে হয়, এবং সে চলে যাওয়ার পর আব্দুর রহমান পুনরায় ডাকে, ইদ্রিস!

এবার হয়তো ইদ্রিসের দোকানে আর কোন গ্রাহক থাকে না, সে বলে, ডাক পাড়েন ক্যালা, খামাখা?

- মনে হয় হাতে চুনা লাইগা গেল আবার!

জ্যোৎস্নার মা চলে যাওয়ার পর হয়তো ইদ্রিস বেখেয়াল হয়া পড়ে, সে জন্য, অথবা হয়তো অন্য কোন কারণে, মনে হয় সে যেন আব্দুর রহমানের কথা বুঝতে পারে না, বলে, চুনা?

- খাম্বার গায়ে আছিল। হাত দিয়া ধরছি, লাইগা গেল; তুমার গাহাকরা মিঞা এই খাম্বার লগে চুনা মুইছা থুয়া যায়!

- চুনা না, অন্য কিছু। পান খায়া কাস্টমার অতদূরে যায়া চুনা মোছে না, আপনের হাতে অন্য কিছু লাগচে!

আব্দুর রহমানের মনে হয় যে, ইদ্রিস আলি হয়তো মশকারি করে, ফলে সে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং বলে, না, চুনাই মনে হয়। তুমি তো কইছিলা তোমার কাস্টমাররা খাম্বার লগে চুনা মোছে!

কিন্তু ইদ্রিস আলির দয়া হয় না, সে হয়তো আব্দুর রহমানের সঙ্গে খেলা করতে চায়, ভোগাতে চায় তাকে; হয়তো জ্যোৎস্নার মা যখন দোকানে ছিল তখন বিরক্ত করার জন্য শোধ নেয়, বলে, কইছিলাম নিকি, মনে হয় না; আপনের হাতে হয়তো চুনা লাগে নাইকা!

- তাইলে কি লাগলো, নরম আঠাআঠা?

- কাউয়ার গু হইতে পারে! শুইঙ্গা দেখেন কড়া গন্ধ পাইবেন!

আব্দুর রহমান শুঁকে দেখে, বলে, বুঝি না কিছু, হইতে পারে!

ইদ্রিস আলির অন্তর তখন হয়তো নরম হয়, কারণ আব্দুর রহমানকে দেখলে তার হয়তো কেরাসিন বাত্তির গল্পের কথা মনে পড়ে, এবং তার ইচ্ছা হয় আব্দুর রহমানের কাছ থেকে এই কথা শুনতে। তখন সে আব্দুর রহমানকে ডাকে, খাড়ায়া না থেকে এসে টুলে বসার কথা বলে। আব্দুর রহমানের হয়তো খাড়ায়া থাকতেই ভাল লাগে, তবু সে এসে নিচা টুলের উপরে দুই পায়ে প্যাঁচ দিয়া বসে। ইদ্রিস আলি তখন তাকে পান খাওয়াতে চায়, কিন্তু সে পান খায় না, বলে, একটা বোঁটা দেও।

ইদ্রিস আলি বোঁটা ভেঙ্গে দেয়, তারপর বলে, আপনেরা, আপনে আর আবুল হোসেন মিঞায় নিকি রাস্তার কেরাসিন বাত্তির জায়গা বিচরান?

- না, বিচরামু ক্যালা, এমনেই, - এইখানে, কিম্বা মামুনগো বাড়ির সামনে হয়তো আছিল; বাত্তিওয়ালা হাইনজা বেলা আয়া জ্বালায়া দিয়া যাইতো, টিমটিম কইরা জ্বলতো, অখনে যেমুন তোমাগো ইলেকট্রিকের বাত্তি টিমটিমায়া জ্বলে!

ইদ্রিস আলির হয়তো ভাল লাগে অথবা সে হয়তো মশকারিই করে, বলে, ভালা মত খুঁজেন না ক্যালা? খুঁইজা বাইর করেন কই আছিল?

কিন্তু রাস্তার কেরাসিন বাত্তির জায়গা খুঁজে বের করার ব্যাপারে আব্দুর রহমানের ইচ্ছা কিংবা বাসনা হয়তো স্তিমিত হয়া আসে; হয়তো তারা, সে এবং আবুল হোসেন, মন্দিরের গলির ভিতরে হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়া পড়ে। অতঃপর তারা যখন কোনক্রমেই বাত্তির জায়গার বিষয়ে একমত হতে পারে না, তারা মহল্লার অন্য বুড়া লোকদের জিজ্ঞাস করে, ফলে তাদের বিভ্রান্তি হয়তো আরো বাড়ে এবং এক পর্যায়ে বচসার ভিতর দিয়া বিষয়টা শেষ হয়। ইদ্রিস আলির দোকানে হয়তো আলমগির, বাবুল কিংবা ফখরুল আলম ওরফে লেদু আসে, তারা হয়তো মাঙনা পান খায়, তারপর কেরাসিনের বাত্তি খোঁজার গল্প করে। তারা বোঝে, এটা পাগলামি, অথবা হয়তো অন্য কিছু; এবং তারা বলে যে, জিঞ্জিরায় সুপিয়া আকতারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আব্দুর রহমান কাহিল হয়ে পড়ে।

ভূতের গলির লোকেরা আব্দুর রহমানের এই শোকের বিষয়ে নিশ্চিতই হয়, তারা বলে যে, জিঞ্জিরায় ২/৪/১৯৭১ তারিখ শুক্রবার সকালে পাকিস্তানি মিলিটারির গুলির মুখ থেকে বেঁচে আসার পর রাতে চেয়ারম্যান বাড়ির কোথাও যখন তাদের দেখা হয় এবং তারা কথা বলতে পারে, তখন সুপিয়া যতই বলুক যে, চম্পা ফুলের কথা তার মনে নাই, এই কথা বিশ্বাস করা যায় না; কারণ

সুপিয়ার পক্ষে এই কথা কেমন করে ভুলে যাওয়া সম্ভব? সে প্রথমে হয়তো এমনি বলে যে, তার মনে নাই, তারপর হয়তো আব্দুর রহমান কোন জানালা অথবা বারান্দার গ্রিল ধরে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকায়া থাকে এবং তখন, অনেকক্ষণ পর সুপিয়া আকতার সেই কথা বলে, যে কথা শুনে আব্দুর রহমানের অন্তর চাপা খায়া গুঁড়া হয়। তবে সেদিন সুপিয়া আকতারকে অবশেষে চম্পা ফুলের গল্প করতেই হয়, সে বলে যে, চম্পা ফুলের ডাল আব্দুর রহমানের কোলের উপর ফালায়া দেওয়ার পর ১ম দিন আব্দুর রহমান যখন বাত্তিওয়ালার পিছনে উঠে যায়, সে কিছুক্ষণ খাড়ায়া থাকে তারপর ডালটা আবার নিজেই তুলে নিয়া আসে। ২য় দিন হয়তো তার মনে হয় যে, এই দিন সব ঠিক হয়া যাবে, কিন্তু তা হয় না, আব্দুর রহমান বাত্তিওয়ালার পিছনেই যায়। দুই দিন আব্দুর রহমানের এরকম আচরণের পর ৩য় দিন তার প্রথম থেকে ভয় হয় এবং সে চিন্তা করে সন্ধ্যায় বাত্তিওয়ালা যখন আসে তখন সে মহল্লায় ফিরবে না; কিন্তু এ বিষয়ে তার কিছুই করার থাকে না, কারণ তাকে তার আম্মা এবং দাদির সঙ্গে সন্ধ্যা বেলাতেই মহল্লায় ফিরতে হয়, এবং এদিনও আব্দুর রহমান একই কাজ করে।

আব্দুর রহমান অন্ধকার বারান্দায় খাড়ায়া এই কথা শোনে, অথবা হয়তো বারান্দাটা অন্ধকার ছিল না, কারণ, সে সুপিয়াকে একটুখানি দূরে একটা দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়া খাড়ানো দেখে; অনেকদিন পূর্বেকার চম্পা ফুলের গল্প করতে যায়া তার গলার স্বর হয়তো নিচা ও ভারি হয়া আসে, বুকের একদিকের কাপড় সরে যায়, এবং বিদ্যুৎ বাত্তির ম্লাণ আলোয় আব্দুর রহমান দেখে যে, অন্তর্বাস না পরার জন্য সুপিয়ার বুকের নির্গলিত দুধে স্তনের বোঁটার কাছে ব্লাউসের ভিজে কালো হয়া আছে। তখন আব্দুর রহমানের এই শোক হয়, এবং সে তা অনেক দিন চেপে রাখে, কিন্তু শেষে সে মাথা ধরার ব্যারামে আক্রান্ত হয় এবং গোপনে রাস্তার কিনারার কেরাসিন বাত্তির জায়গা খোঁজার ছলে হয়রান হয় অন্য কিছু খুঁজে। এই হয়রানিতে তার মাথা ধরা বাড়ে এবং তার মাথায় ভিকস মালিশ করার পর পানির পট্টি লাগায়া ঝরণা বেগম বলে, খামাখা আপনে বিমারি হয়া থাকেন, আমার ভালা লাগে না; আপনে এইসব ভুইলা যান না ক্যালা?

এবং তখন আব্দুর রহমান সব ভুলে যায়।

তারপরেও হয়তো সে সবকিছু ভুলে যায় না, হয়তো পারে না ভুলে যেতে, কিংবা হয়তো পারে; কারণ কঠিন মাথা ব্যাথায় ভোগার চাইতে হয়তো মনে হয় যে, বিস্মরণ খারাপ কি; এবং সে বলে, কেরাসিনের বাত্তি খুঁজুম ক্যালা? আমি পাগল নিকি?

তাহলে আব্দুর রহমান হয়তো রাস্তার কিনারার কেরাসিনের বাত্তি আর খোঁজে না, কিন্তু তারপরেও চম্পা ফুলের কথা থাকে; এই গল্প জিঞ্জিরা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সেখানে ভুলে গেছি বলার পরেও সুফিয়া আকতার কত কথা বলে, তবে তারপর আচমকা প্যাঁচ লাগে। হয়তো ইদ্রিস আলির বেপরোয়া অনুসন্ধিৎসার কারণেই এরকম হয়, বিষয়টা বাঁক খায়া জটিল হয়া ওঠে। তবে পুনরায়, সত্য যেহেতু সবসময়ই সত্য, তার উদঘাটন হওয়া দরকার; ফলে, আব্দুর রহমানের পরবর্তী মাথা ধরার দিন অথবা অন্য কোন এক দিন সে তার ৩৬ নম্বর বাড়ি থেকে বের হয়া রাস্তার কোনায় যায়া খাড়ায় এবং পা ধরে গেলে বাম হাত বাড়ায়া ইলেক্ট্রিকের খাম্বার সঙ্গে ঠেস দেওয়ার চেষ্টা করলে তার হাতে কেদোর মত নরম কিছু লেগে যায়। তখন সে দূরে ইদ্রিসের দোকানের দিকে তাকায়া বলে, ইদ্রিস, আবারো কাউয়ার গু লাগলো হাতে!

ইদ্রিস তাকে কাছে ডেকে আনে, নিচা টুলের উপরে বসায়, পানের বোঁটা ভেঙ্গে দেয়, তারপর আসল কথা জিজ্ঞাস করে, বলে, আপনেরা যখন নিকি ছুটু আছিলেন মসজিদের গল্লিতে হুমুগো এক ভাড়াইট্টার এউকগা মাইয়া আছিল না, সুপিয়া নাম?

- এই কথা জিগাও ক্যালা?
- না, এমনেই জিগাই।

তখন ইদ্রিস আলি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে যে, আব্দুর রহমান এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বিষয়টা নিয়া চিন্তা করে, - তাহলে কি সে সব ভুলে গেল, সেটা কি সম্ভব? হয়তো সম্ভব, হয়তো সম্ভব না; তবু সে বলে, হুমুগো ভাড়াইটার মাইয়ার নাম সুপিয়া আছিল নিকি?

- আছিল না? হুনচি নাম আছিল, সুপিয়া।
- কার কাছে হুনছো?

ইদ্রিস আলি এবার চুপ করে থাকে, আব্দুর রহমান মিঞা পুনরায় ভাবে এবং তার মনে হয় যে, দীর্ঘদিন পূর্বে হুমায়ুনদের বাসায় থাকা কোন ভাড়াইটার মেয়ের নাম হয়তো সুপিয়া ছিল না, হয়তো অন্য কিছু ছিল, হয়তো মেয়েটার নাম ছিল, শামিমা। তবে ইদ্রিস আলির মুখের দিকে সেই সন্ধ্যায় তাকায়া তার হয়তো মনে হয় যে, ইদ্রিসের একটা উত্তর পাওয়া দরকার, এবং তখন সে নিশ্চিত হয়, হুমুদের বাড়িতে শামিমারাই ছিল; অথবা, সে কি সুযোগ বুঝে ইদ্রিস আলির উপর প্রতিশোধ নেয় তার সঙ্গে পানের চুনা/কাকের গু বিষয়ক মশকারি করার জন্য? বোঝা মুশকিল; সে বলে, সুপিয়া কে চিনতে পারলাম না, মনে করতে পারি না;

হুমুগো বাইতে মনে হয় এক ভাড়াইটা আছিল, তার মাইয়ার নাম আছিল মনে হয়, শামিমা।

ইদ্রিস আলির ব্যাপারটা বুঝতে যারপর নাই কষ্ট হয়, সে বিভ্রান্ত হয়া পড়ে; সুপিয়া না, এটা ছিল শামিমা! হতে পারে, নয় কেন?

তাহলে, অনেকদিন আগে হয়তো আব্দুর রহমান এবং আবুল হোসেন মন্দিরের বারান্দায় লুঙ্গি আর হাতা কাটা গেঞ্জি পরে বসে ছিল তখন সন্ধ্যা বেলা জোড়পুলের দিক থেকে তার আম্মা অথবা দাদি আম্মার সঙ্গে শামিমা, হয়তো শামিমা বেগম অথবা সুলতানা, হাতে বড় সাইজের একটা জাম্বুরা নিয়া হেঁটে আসে।

২০০২

# ডলু নদীর হাওয়া

ডলু নদীতে এখন অনেক পানি, অথবা হয়তো পানি তেমন নাই, তবু ঐ দিক থেকে ভিজা হাওয়া বয়ে আসে, এবং এই হাওয়ার সঙ্গে আসে নদী পাড়ের বাঁশ ঝাড়ের ভেতরকার গুয়ের গন্ধ; তখন আহম্মদ তৈমুর আলি চৌধুরি তার বাসার সামনে রাস্তার পাশে একটা নিচা ইজি চেয়ারের ভিতরে পোটলার মত ঝুলে বসে থাকে। হয়তো সে রোদের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে, অথবা ডলু নদীর সকালের বাতাসে শুকনা গুয়ের গন্ধ সত্ত্বেও আরামে এমনি তার চোখ বন্ধ হয়ে আসে। তখন সে তার ডান পা বাম পায়ের হাঁটুর ওপর তুলে দেয়, ফলে লুঙ্গি নিচের দিকে নেমে হাঁ হয়ে থাকে এবং এই ফাঁক দিয়ে বড় তালের আঁটির মত তার খয়েরি রঙের প্রাচীন হোলের বিচি দেখা যায়!

সাতকানিয়ার লোকেরা, যারা বাজারে যায় অথবা বাজার থেকে বোয়ালিয়া পাড়া কিংবা সতী পাড়ার দিকে ফেরে, তারা মসজিদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখে যে, তৈমুর আলি লুঙ্গি ফাঁক করে রেখে ইজি চেয়ারে বসে ঘুমায়, তাদের হয়তো মনে হয় যে, কত বড় বিচি, অথবা তারা হয়তো কিছু দেখে না, হয়তো ভাবে একই জিনিস প্রত্যেক দিন দেখার দরকার কি, তারা হয়তো কেবল ইজি চেয়ারের খোলের ভিতরে কুঁজা হয়ে বসা তার কাত হয়ে থাকা মুখের দিকে তাকায়, সেখানে হয়তো একটা/দুইটা নীল কিংবা কালা মাছি বসে গালের লালা খায়; তারপর রোদ গরম হয়ে উঠলে সে ইজি চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভিতরে যায়, সেখানে তার স্ত্রী, বুড়া সমর্ত বানু নাস্তা বানিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে।

তৈমুর আলি চৌধুরি যখন ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় তখন বোঝা যায় যে, সে খোঁড়া বা লুলা বা ভেঙ্গুর, কারণ হাঁটার সময় সে খুঁড়িয়ে বা লেংচিয়ে হাঁটে; তাকে সাতকানিয়া মডেল হাই ইস্কুলের কিছু বদমাশ ছাত্র কখনো হয়তো

তৈমুরলঙ বলে ডাকে, তবে বৃদ্ধ তৈমুর আলির বৃদ্ধতর মা, গোলেনুর বেগম নিশ্চয়ই এই খঞ্জত্বের ইতিহাস জানে, কিন্তু তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাস করা হলে সে বিভ্রান্ত হয় অথবা বিভ্রান্ত করে। কথা শুনে সে প্রথমে তার অন্ধকার ঘরের ভিতরে শোয়া অবস্থা থেকে নোংরা লেপ খেতার উপর উঠে বসার চেষ্টা করে, তারপর যখন উঠতে পারে না, বিছানায় কাত হয়ে থেকে হাড়ের সঙ্গে চামড়া লেপ্টে মমির মত শুঁটকি মেরে যাওয়া একটা হাত নিজের চোখের সামনে উঁচা করে ধরে বাতাসে বিলি কেটে টনটনা গলায় বলে, অ'নে, আঁরার তৈমুরগিয়ার হত পুছাল্লন্দে না, বা'জি? আছেতো, চ'অন না, গরোত আছেতো!

তারপর তাকে যখন বলা হয় যে, তার ছেলে তৈমুরকে খোঁজা হচ্ছে না, বরং সে কেমন করে খোঁড়া হয়ে গেল তা জানতে চাওয়া হচ্ছে, তখনও কি গোলেনুর সে কথা শুনতে পায় না? কারণ সে বলে, আঁরাতো বর্মায় আছিলামদে, আকিয়াব না পেগু আঁই মনে করির ন ফারি, তৈমুরগিয়ার বাপে আঁরে যেয়েত্তে বিয়া গরি আনে, আঁর বয়স আছিল দুই বচ্ছর।

বিয়ের জন্য এই বয়স একেবারেই অসম্ভব মনে হলে, তাকে তা বলা হয় এবং অবশেষে গোলেনুর বেগম দুই হাতের আঙ্গুল এবং আঙ্গুলের গিরা গুনে এটুকু মানতে রাজি হয় যে, তার বয়স তখন হয়তো ছিল নয়/দশ; তারা পাহাড় এবং পানি পার হয়ে জাহাজ এবং সাম্পানে চড়ে দোহাজারিতে শঙ্খ নদীর ঘাটে এসে নামে, তখন হয়তো দোহাজারিতে কাছেই রেল ইস্টিশন ছিল কিন্তু নদীর উপরে ব্রিজ ছিল না । সে বলে যে, তারপর তার আর মনে নাই, ভুলি গেই-য়ি বা'জি! ফলে, তৈমুর আলি চৌধুরি কেমন করে লেংড়া হয়ে গেল তাকে যখন তা ৩য় বারের মত জিজ্ঞাস করা হয়, সে প্রবলভাবে এটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, তার এই ছেলে জন্মের সময়তো লেংড়া ছিল না, সে লেংড়া হয় পরে। তখন এই উত্তেজনা অথবা কথা বলার ক্লান্তির কারণে সে তার হাত নাচানো বন্ধ করে দেহের পাশে রেখে চোখ বুজে থাকে, তারপর বলে, কো'আলে আছিলদে, কা'আলে!

হয়তো তাই হবে, কপালেরই দোষ হবে; আহম্মদ তৈমুর আলি চৌধুরির বয়স যখন সাতাশ/আটাশ তখন তার কপালের এই চক্কর তৈরি হয়।

এখন ক্যানভাসের ইজি চেয়ারে লুঙ্গি ফাঁক করে শুয়ে ঘুম দেয়ার পর সে যখন ওঠে, তার বড় ছেলে/মেজ ছেলে/সেজ ছেলে/ছোট ছেলে/কাজের ছেলে/মেয়ের জামাই অথবা নাতিপুতিরা এবং তার ব্যক্তিগত মোটর গাড়ির ড্রাইভার বাইরের ঘরে বসে দুই দিনের পুরান পত্রিকা পড়ে অথবা গল্প করে এবং তাকে দেখে বলে, অ'নে চাটিগাঁ যাইবেন না? গাড়ি যা'র, গেলে য'ন ।

- ছরোত যাই ক্যান কইরগাম?
- কিয়া? অ'নে কইলেনদে না ডিসি না এসডু-রে চাইত যাইবেন?

আজিয়া ন যাইযুম, আজিয়া আঁত্থে গম ন লা'র!

তার আজকে কেন ভাল লাগে না সে কথা সে ভেঙ্গে বলে না, অথবা তার হয়তো মনে পড়ে যে, তার এখনো নাস্তা খাওয়া হয় নাই, তাই চট্টগ্রাম শহরে ডিসি কিংবা এসডিও'র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার বদলে সে বাড়ির ভিতরে যায়, সেখানে সমর্ত তার জন্য নাস্তা নিয়ে একা অপেক্ষা করে; কারণ বাড়িতে থাকলে তৈমুর আলিকে খাওয়ানোর কাজটার দায়িত্ব একা সমর্ত বানুর, এ সময় একটা মাছিরও ঘরে থাকা নিষেধ। তৈমুর আলি মিঞা খাটের উপরে পা তুলে গুটিয়ে বসে পেঁপে কিংবা বেগুন কিংবা পটল ভাজি অথবা চিনি কিংবা গুড় দিয়ে আটার বেলা রুটি খায়; সমর্ত বানু দাঁড়িয়ে থেকে অথবা খাটের কিনারায় বসে খাওয়া দেখে, তারপর সে ঘরের কোনায় রাখা টেবিলের উপর থেকে দুই হাতে দুইটা পানি ভরা কাচের গ্লাস নিয়ে আসে। এখন বুড়া হয়ে যাওয়া তৈমুর আলি গ্লাস দুইটার দিকে দেখে, বলে, আজিয়া জ'অর ন দঅও ফানলার? এই কথা শুনে সমর্ত বানু তার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকায়, সে তাকে বলে যে, সে তার বাপের মেয়ে, তার বাপের নাম ছিল জসিমউদ্দিন ওরফে জইস্‌স্যা করাতি, আর তার মায়ের নাম 'আরাকানের অঙমেচিং', তার যে কথা সেই কাজ; সে বলেছে সে তৈমুর আলিকে জহর দিয়ে মারবে, এবং তা সে মারবেই - নেহায়েত কপাল গুনে সে, তৈমুর আলি, এত দিন বেঁচে গেছে। তখন তৈমুর আলি এই খেলা অথবা নিয়তির কাছে পুনরায় আত্মসমর্পণ করে, সমর্ত বানুর দুই হাতের দুই গ্লাসের ভিতর থেকে একটাকে বেছে নিয়ে পানি খায় এবং এদিনও সে মরে না; সমর্ত তাকিয়ে থেকে দেখে, তারপর অন্য গ্লাসটা বাইরে উঠানে নিয়ে গিয়ে পানি ফেলে দেয়; এবং তখন বাড়ির অন্য লোকদের জানা হয় যে, তৈমুর আলি মিঞার নাস্তা খাওয়া শেষ হল।

তখন মনে হয় যে, অন্তত গোলেনুর বেগম হয়তো জানে এগুলা কি ঘটনা; কিন্তু তাকে জিজ্ঞাস করা হলে, সে বলে, আঁই কইর ন পারি। হয়তো তার জানা ছিল না, অথবা হয়তো সে জানতো যে, এটা একটা খেলা, সমর্ত বানুর সঙ্গে এক চুক্তির নিয়মানুযায়ী তারা এই খেলা খেলে; হয়তো কালক্রমে তৈমুর আলির এতে ক্লান্তি এসে যায়, কিন্তু সমর্ত তাকে ছাড়ে না। যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের পরে বার্ধক্যের দিন গভীরতর হয় - সমর্ত বানুর ডান হাতের মধ্যের আঙ্গুলে পরা একটা আংটি চামড়া এবং মাংসের ভিতরে গেড়ে বসে থাকে, অথবা হয়তো বুড়া হয়ে যাওয়ার পর এটা ঢিলা হয়ে আসে- তথাপি তৈমুর আলি চৌধুরির দিন কাটে পানিতে সমর্তের হীরার আংটি ডুবিয়ে তৈরি করা বিষ খেয়ে মরা অথবা না মরার খেলায়। জসিমউদ্দিন করাতি এবং মগ রমণী অঙমেচিংয়ের মেয়ে, সমর্ত বানুর সঙ্গে পা ভাঙ্গার ভিতর দিয়ে অথবা তার আগেই তৈমুর আলি চৌধুরি জড়িয়ে পড়ে

এবং তা অব্যাহত থাকে, ফলে বিয়ের আগে তৈমুর আলি সমর্তের ২য় চুক্তির শর্তে রাজি হয়। প্রথমে সে হয়তো ভাবে নাই যে, দুই গ্লাসের পানির খেলা এত ঘোরালো হয়ে উঠবে, সে ভেবেছিল যে, ছল চাতুরী করে এইসব শর্তফর্ত অকার্যকর করে দেয়া যাবে, যেমন আগেও সে করেছে; অথবা তার হয়তো মনে হয়েছিল যে, সমর্ত হয়তো সত্যি কথা বলে না, ধাপ্পা দেয়, যেমন আগেও সে দিয়েছে, - আসলে গ্লাসের পানিতে কোন বিষটিষ নাই। এই সন্দেহ জীবনে তাকে একাধিকবার আক্রান্ত করে, তার মনে হয় যে, সমর্ত তাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে মজা করে; কিন্তু সমর্ত বানু তার এই সন্দেহকে আমল দেয় না, সে এই খেলা তৈমুর আলির জীবৎকাল পর্যন্ত জারি রাখে এবং বিষ দিয়ে মারার ক্ষমতা সম্পর্কে দুইবার প্রমাণ দেয়। প্রথমবার দেয় বিয়ের রাতেই বিড়াল মেরে, যদিও পুরুষ হিসাবে তৈমুর আলিরই তা মারার কথা ছিল; বিয়ের দিন মসজিদের মৌলবি কলেমা পড়িয়ে যাওয়ার পর সে তামাশা করে সমর্ত বানুর কাছে জানতে চায় যে, সমর্ত বানু তাকে আজকেই বিষ দেবে কিনা। কিন্তু মনে হয় যে, সমর্ত এই রসিকতাকে হাল্কাভাবে নেয় না, কারণ, পরে সেদিন রাতে তৈমুর আলি যখন বাসরে প্রবেশ করতে যায় সে দেখে যে, ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ; দরজা ধাক্কানোর পর সমর্ত কপাট একটু ফাঁক করে বলে যে, ঘরে ঢুকতে হলে জামাইকে হাতে করে দুইটা বিড়াল নিয়ে ঢুকতে হবে। এই উদ্ভট আব্দার শুনে বাড়ির সকলে বিরক্ত হয়, তবু নতুন বৌ বলে লোকে বিড়ালের খোঁজে বের হয় এবং বোয়ালিয়া পাড়ায় নাপিচা আক্তারদের বাড়ি থেকে এক জোড়া বিড়াল সংগ্রহ করে আনে। তৈমুর আলি সেদিন পায়জামা এবং আচকান পরে দুই বগলে দুই বিড়াল চেপে ধরে বাসর ঘরে প্রবেশ করে দেখে যে, ঘরের এক কোনায় টেবিলের উপরে দুইটা ছোট বাটিতে ক্ষির অথবা পায়েস এবং দুইটা পিতল অথবা কাঁসার গ্লাসে পানি রাখা আছে। তার হয়তো মনে হয় যে, এই খাদ্য এবং পানীয় পরিশ্রান্ত হওয়ার পর খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছে, কিন্তু সে ঘরে ঢুকলে সমর্ত বানু ক্ষিরের বাটিতে গ্লাসের পানি ঢেলে মেশায় তারপর বিড়াল দুইটাকে নিয়ে গিয়ে তা খেতে দেয়। ক্ষির খাওয়া হয়ে গেলে একটা পরিতৃপ্ত বিড়াল ঠোঁট চেটে ম্যাও ম্যাও করে, অন্যটা একটা লাফ দিয়ে ঘরের মেঝের উপর চারপা ছড়িয়ে ফট করে মরে পড়ে থাকে। হতভাগ্য বিড়ালের পরিণতি দেখে তৈমুর আলির হয়তো ভয় হয় এবং এই ভয়কে সে দ্রুত ক্রোধে পরিণত করে, সে তখন দরজা খুলে মরা বিড়াল উঠানে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং যারা বিড়াল মারার পুরানো গল্প জানে তারা হয়তো খুশি হয় এই কথা ভেবে যে, তৈমুর আলি বিয়ের রাতে তাহলে বিড়াল মরলো! তবে সমর্ত বানু বিড়াল মারলেও তখন তৈমুর আলির চেহারা দেখলে মনে হতো যে, সেটা সেই মেরেছে, রাগে তার চোখমুখ থেকে ভাপ বের হতে থাকে এবং সেদিন

উত্তেজনা ও ক্রোধের এই সম্মিলিত দানবীয় প্রকাশের সামনে সমর্ত বাত্যাপীড়িত তৃণের মত দলিত হয়; অতঃপর তৈমুর আলি যখন পানি খাওয়ার জন্য টেবিলের কাছে যায় সে দেখে যে, দুটো গ্লাসে পানি ভরে রাখা হয়েছে। তখন তার উত্তেজনা নেমে আসে এবং সে খেলাটাকে মেনে নেয়; একটা গ্লাস তুলে নিয়ে পান করে, অন্য গ্লাসের পানি সমর্ত জানালা ফাঁক করে বাইরে ফেলে দেয়। সেই শুরু হয়, তারপর আর যেন শেষ নাই; তৈমুর আলি হয়তো পুনরায় বিষয়টাকে ভাঁওতাবাজি ভাবতে থাকে, তখন অনেক বছর পর সমর্ত পুনরায় একটা বিড়াল অথবা কুত্তা অথবা ছাগল মেরে আহম্মদ তৈমুর আলিকে ভয় দেখায়।

তারপর অনেক সময় পার হয় এবং তৈমুর আলি চৌধুরি বুড়া হয়ে ইজি চেয়ারে বসে হাঁ করে ঘুমাতে শুরু করে; তখন একদিন রোদ চড়ে গেলে সে উঠে বাড়ির ভিতরে যায় নাস্তা করার জন্য। এইদিন হয়তো আলু অথবা চিচিংগা অথবা চাল কুমড়া ভাজি দিয়ে তার রুটি খেতে ভাল লাগে না, সে চিনি দিয়ে খেতে চায়; ফলে তখন সমর্ত চিনি আনার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যায়। বুড়া তৈমুর আলি বসে থেকে দেখে যে, ঘরের কোনায় টেবিলের উপরে পানি ভরতি দুইটা গ্লাস, এবং তখন ব্যাপারটা ঘটে; হয়তো এই প্রথম সমর্ত বানুর চালাকি ধরে ফেলার বিপজ্জনক বুদ্ধিটা তার মাথায় আসে অথবা হয়তো সে বেশি পিপাসার্ত হয়ে বে-খেয়ালে কাজটা করে - খাট থেকে নেমে দুই গ্লাসের সব পানি খেয়ে নেয়।

এই চক্কর শুরু হয় অনেক আগে, যদিও বার্মা থেকে তৈমুর আলি যখন ফিরে আসে তখন মনে হয় নাই যে, সে এরকম চক্করে পড়ার মানুষ। তবে, তখন ধান কাটা হয়ে গেলে অঘ্রান কিংবা পৌষের এক বিকালে ২য় একটা শালিখ পাখি খুঁজতে গিয়ে সমর্ত বানুর সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয় এবং সে এই পরিস্থিতিতে পড়ে।

এক শালিখ দেখে দিশা হারা হওয়ার দশ বছর আগে তৈমুর আলি তার বাপ, মওলা বকশ চৌধুরির কাঠের সিন্দুক ভেঙ্গে উধাও হয়ে যায় ; হয়তো সে সাম্পান অথবা জাহাজে চড়ে আকিয়াব যায়, আকিয়াব থেকে রেঙ্গুন অথবা পেগু, এবং সেখান থেকে হয়তো রেলগাড়িতে করে মান্দালয়। সেখানে সে হয়তো 'আল্লাহ মালুম' জাতীয় কিছু করছিল - ভালই করছিল; কিন্তু একদিন সে তার অতীত ঝেড়ে মুছে থুয়ে গ্রামে ফিরে আসে। সাতকানিয়া বা সাতকাইন্ন্যা তখন গ্রামই ছিল, কিংবা গ্রামের চাইতেও বেশি; হয়তো ডলু নদী পার হয়ে চিতা বাঘ এসে গাছে চড়ে বসে থাকতো, রাতের বেলা চরম্বার পাহাড় থেকে মাদারসার ভিতর দিয়ে নেমে আসতো বুনো হাতীর পাল। তখন একমাত্র জীবিত সন্তান, তৈমুরকে ফিরে পেয়ে তার মা খুশি হয়, হয়তো তার বাপও, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা হয় না, কারণ, তাদের ঘরের যুবতী এবং অনতি-যুবতী মেয়েদের নিয়ে সে নানান সঙ্কট

তৈরি করে, হুসনেআরা/মনোয়ারা/রশেনারারা গোপনে কান্দে, তাদের মায়েরা মাথায় তুলে দেয়া নোংড়া এবং ন্যাতার মত শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়ে ধরে চেহারা মলিন বানিয়ে রাখে, এবং তারা মওলা বকশের কাছে গিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দেয়; বিপন্ন নারীদের দুই/চার/দশ ফোটা তপ্ত অশ্রু মাটিতে পড়ে দাগ হয়ে থাকে, তবে মওলা বকশ কিছু করতে পারে না, সে ছেলের বাপ হওয়ার সুবিধাজনক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে বলে, আঁই ন জানি, আঁই কি কইরগাম!

তখন একদিন তৈমুর আলির জীবনে এক-শালিখ দেখার দুর্ভাগ্য নেমে আসে।

তখন হয়তো সে একা ছিল অথবা হয়তো সঙ্গে ছিল তার বন্ধু নুরে আলম অথবা ইউসুফ অথবা তারা দুই জনই; তারা হয়তো ডলু নদীর কিনারার বাঁশ ঝাড়ের পাশের রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল, এবং তখন বোয়ালিয়া পাড়ার প্রান্ত সীমায় তারা কোন এক জায়গায় দেখে যে, মাটির রাস্তার ঢালে ঘাসের উপরে খয়েরি রঙের একটা শালিখ মাথা নিচা করে কিছু খুঁটে খায়। এক শালিখ দেখে তাদের খারাপ লাগে, তবে তাদের মনে হয় যে, আর একটা শালিখ নিশ্চয়ই ধারে কাছেই থাকবে; তারা হেঁটে যেতে থাকে এবং এদিক ওদিক এই পাখিটাকে খোঁজে, কিন্তু ২য় শালিখটাকে তারা দেখতে পায় না। তখন ২য় পাখিটাকে খুঁজতে গিয়ে তারা দেখে যে, দূরে নদীর পাড়ে ঘাসের উপর বসে আছে একটা মেয়ে এবং তার কাছেই খালি গায়ে লুঙ্গি পরা এক যুবক দাঁড়িয়ে।

তৈমুর আলি মেয়েটাকে চিনতে পারে না, তার প্রথমে মনে হয় যে, এটা হুসনেআরা/মনোয়ারা/রশেনারাদের মতই একজন কেউ হবে, হয়তো জমিলা/কামিলা কিংবা আলফুন, সে বলে, ওডা ইসুইপ্‌প্যা, মাইয়া ফোয়া ইবা ক'ন?

নুরে আলম অথবা ইউসুফের জসিমউদ্দিন ওরফে জইস্‌স্যা করাতির পনর বছর বয়সী পাকনা মেয়ে সমর্ত ওরফে সমর্ত বানুকে চেনা ছিল, তারা তৈমুর আলির কথা শুনে বলে, ইবা সমর্ত, জইস্‌স্যা করাতির মাইয়া, সমর্ত বানু।

আগে ন চাই ফানলার?

তৈমুর আলি চৌধুরি বার্মায় যাওয়ার আগে সমর্ত এবং তার বাপকে হয়তো দেখে নাই, কারণ তখন আবু বক্কর করাতির ছেলে জসিম করাতিও প্রথমে বার্মা চলে যায় পরে দেশে ফিরে চিরিংগায় কাঠের গোলায় করাতির কাজ নেয় এবং মাতামুহুরির পাড়ে তার আরাকানি স্ত্রী অঙমেচিং এবং মেয়ে সমর্তকে নিয়ে বাস করে। তারপর একদিন অঙমেচিং পোটকা মাছ খেয়ে মরে যায়- সমর্ত এবং জসিম করাতি কেন মরে না সেটা এক রহস্য; তবে মরে যাওয়ার সময় সে

বালিকা সমর্তকে কাছে ডেকে নিয়ে তার কানে কানে কথা বলে এবং কাপড়ের টোপলার ভিতর থেকে একটা আংটি বের করে তার ডান হাতের মধ্যের আঙ্গুলে পরিয়ে দেয়, আংটিটার মাথায় একটা কাচের মত সাদা স্ফটিক ঝলমল করে। অঙমেচিং মরে গেলে জসিম করাতি তার নিজের গ্রামে ফিরে আসে, এখন সম্পত্তি ভাগ করে ডলু নদীর কিনারে বাড়ি বানিয়ে মেয়েকে নিয়ে থাকে। আরাকানি রমণী অঙমেচিংকে সাতকানিয়ার কেউ দেখে নাই অথবা হয়তো দুই/এক জন দেখেছিল, তবে তারা তা ভুলে যায়; সে ছিল সুন্দরী এবং জাদুকরী এক নারী, তার মৃত্যুর পর জসিমউদ্দিন ওরফে জইস্স্যা করাতি আর বিয়ে করে না, সমদর পাড়া অথবা নদী পার হয়ে কাঞ্চনা কিংবা মির্জাখিল যায়, গিয়ে কাঠের গোলায় কাজ নেয় এবং বর্ষাকালে রাতের বেলা ভরা নদীর পানির কলধ্বনির সঙ্গে যখন অঙমেচিংয়ের গলার স্বর ভেসে আসে, সে পাড়ে বসে তার সঙ্গে কথা বলে। জসিমউদ্দিনকে অঙমেচিং আবার বিয়ে করতে মানা করে, বলে, অ'নে বিয়া খইরলে আঁই ন বাঁইচ্চম, মরি যাইয়ুমগৈ; আঁর মাইয়া ইবায় ন বাঁচিব, মরি যাইবোগৈ! ফলে, তখন জসিম করাতি মৃত অঙমেচিংকে বাঁচানোর জন্য বিয়ে না করে থাকে, মা মরা সমর্ত বড় ও তাগড়া এবং সুন্দরী ও পাকনা হয়ে ওঠে, এবং তার কাচের আংটিটা ডান হাতের আঙ্গুলের স্ফীত গিঁটের নিচে শক্ত হয়ে চেপে বসে। তখন তৈমুর আলি চৌধুরি ২য় শাল্টিখটা খুঁজতে গিয়ে তাকে দেখে এবং ইউসুফ অথবা নুরে আলমকে বলে, মাইয়া ফোয়া ইবারে ডাকি আন!

তখন সমর্ত বানুর আংটির বিষয়ে তৈমুর আলির জানা ছিল না, সমর্ত বানু পরে তাকে বলে যে, তার হাতের আংটির স্ফটিকটা কাচ নয়, হীরা; তার নানা, অঙমেচিংয়ের বাপ আচোরি মং, বার্মায় টিন কিংবা তামা কিংবা রূপার খনিতে কাজ করার সময় এটা কুড়িয়ে পায় এবং বাড়িতে এনে এটা দিয়ে আংটি বানিয়ে মেয়েকে দেয় এবং পরে বোঝা যায় যে, এটা হীরা- হীরায় বিষ থাকে এবং সে তাকে, তৈমুর আলিকে, এই বিষ দিয়ে মারবে। তৈমুর আলি প্রথমে সমর্ত বানুর এই কথা বিশ্বাস করে না, সে তার কথা শুনে হাসে, বলে, আঁরে ক'নে মারিব, তুঁই না? প'অল না কোনো! কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, সমর্ত বানু কোন পাগল না, সে যা বলে তা হয়তো সত্য, তার আংটির কাচটা হয়তো আসলেই হীরা এবং এই হীরায় হয়তো বিষ আছে; তবে তৈমুর আলির তখন আর কিছু করার থাকে না। সে সমর্তের আঙ্গুল থেকে জোর করে আংটিটা খুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়, তারপর সে বাজার থেকে গৌরসুন্দর কামারকে ডেকে আনে, কামার গৌরসুন্দর দেখে যে, আংটির লোহার চাকতি সমর্তের আঙ্গুলের চামড়ার ভিতরে এমন শক্তভাবে বসে গেছে, এটাকে কেটে আলাদা করার কোন উপায় নাই।

এ বিষয়ে তৈমুর আলি আর কিছু বলে না, এবং তখন মনে হয় যে, গোলেনুর হয়তো বিষয়টা জানে; তাকে জিজ্ঞাস করা হলে সে পুনরায় তার বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করে, তারপর শুয়ে থেকে বলে, আঁর বৌয়ের কথা পুছাল্লন্দে না, বা'জি? ওর মায়তো মগ আছিলদে, আঁরা বার্মায় আছিলাম, কিন্তু আঁরা মগ ন আছিলাম। তখন তাকে হীরার আংটির কথা জিজ্ঞাস করা হলে সে বলে যে, সে হীরার আংটির কথা জানে না, তবে বোঝা যায় সে সমতের্র উপরে খুশি না।

এক শালিখ দেখার পর এইসব শুরু হয়, সেদিন তৈমুর আলির কথা শুনে ইউসুফ অথবা নুরে আলম রাস্তা থেকে নেমে ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে গিয়ে সমর্ত বানুকে ডেকে আনে, গরীবের মেয়ে হওয়ায় সাহেবরা ডাকার কারণে সমর্ত কিছু জিজ্ঞাস না করেই এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়, বলে, অ'নে আঁরে ডাইক্কন কিয়া?

- আঁরে তুঁই চিনোদ্দে না?
- ন চিনি, কিয়া, অ'নে ক'ন?
- আঁই তুঁয়ারে, আঁরার বাড়িত খাম করিবার লাই রাইক্কম?
- আঁই কাম ন করি!
- কিয়া?
- ন কইরগম!

তৈমুর আলি চৌধুরির রাগ হয় এবং তার এই রাগ সমর্ত বানুর পুরুষ সঙ্গিটার উপর গিয়ে পড়ে; সে যখন পুরুষটা কে তা জানতে চায়, মরদ ফোয়া ওডে তিয়াই রইয়ে ইবা ক'ন? তখন সমর্ত বাঁকা কথা বলে, অ'নে জানিয়েরে কি করিবেনদে, ইবার নাম সুরত জামাল, জামাইল্ল্যা!

তৈমুর আলির কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না, সে বলে, সুরত জামাল ইবা ক'ন? তুঁয়ার ভাই?

- নঅয়, কিয়া?
- এ্যাডে তরা ক্যান করদ্দে?
- ক্যান কইরগম? কিছু ন করি!
- কিছু ন করি কি? দিনের বেলা ফ্রেম করদ্দে না ওডি?
- অ'নে ইন খতা আঁরে ন কইওন!

সেদিন তারপর তৈমুর আলি আর কথা না বলে চলে যায়, সুরত জামাল জইস্স্যা করাতির সঙ্গে সমদর পাড়া,কাঞ্চনা অথবা মির্জাখিলে কাঠের গোলায় কাজ করে আর সুযোগ মত সমর্ত বানুকে ফুসলায়; তৈমুর আলি হয়তো বোকার মত এই কথা তার বাপ মওলা বকশকে বলে এবং তার কথা শুনে মওলা বকশ বুঝতে পারে না সে কি করবে, আঁই কি কইরগম?

তখন সমর্তের কথা তৈমুর আলি কিছুতেই ভুলতে পারে না, কিন্তু তাকে কাবু করা দুষ্কর হয়; একেতো সে জাদুকরী অঙমেচিংয়ের পাকনা মেয়ে, তার উপরে সুরত জামালের ঝামেলা, ফলে কোন আশা দেখা যায় না - সুরত জামালের সাফল্যের কথা মনে হলে তার অন্তর জর্জরিত হয়ে যায় এবং সে বিষয়টা নিয়ে ভাবে। সে তখন ৪টা কাজ করে :

১. ডলু নদীর কিনারায় দারোগার ঘাটে বাঁশ ঝাড় কেঠে কাঠের গোলার ব্যবসা শুরু করে,
২. এই কাঠের গোলায় করাতি হিসাবে রাখে জসিম করাতিকে,
৩. সুরত জামালকে চাকরি দিয়ে আলিকদম পাঠায় তাদের দুইশ বিঘা জমি দেখাশোনা করা এবং সেখানে ঘর বাড়ি বানিয়ে থাকার জন্য, এবং
৪. তারপর একদিন সকালে জসিম করাতিকে সঙ্গে নিয়ে গাছ কেনার জন্য লোহাগাড়া যায়, সেখানে টাকা কম পড়া বা অন্য কোন অজুহাতে জসিম করাতিকে কাঠের ব্যবসায়ীদের কাছে রেখে সে বিকালে একা সাতকানিয়া ফিরে আসে।

সমর্ত বানু হয়তো পাকনা হওয়া সত্ত্বেও তৈমুর আলির এইসব কাজকারবারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারে না, ফলে তৈমুর আলি তার জাল গুটিয়ে আনে, এবং হয়তে নিজেই তাতে ধরা পড়ে; অথবা সমর্ত হয়তো দেরি করে হলেও বিষয়টা বুঝতে পারে এবং লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। লোহাগাড়া থেকে একা ফিরে আসার পর তৈমুর আলি জসিম করাতির বাসায় যায়, সেখানে সমর্ত বানুকে তাদের কুঁড়ে ঘর থেকে ডেকে বের করে সে তাকে বলে যে, জসিমউদ্দিন কালকে অথব পরশু দিন ফিরবে। তারপর সে যখন বলে, আজিয়া রাতিয়া আইস্‌সম, পনর বছরের পাকনা মাইয়া ফেয়া সমর্ত বানুর তার কথা বুঝতে না পারার কারণ থাকে না, এবং তখন তার আংটির বিষের কথা মনে পড়ে- সে তখন নদীর দিকে তাকায় এবং দেখে যে, বিকালের অল্প আলোয় নদীর বুকে ধূসর নীল কুয়াশা জমা হয়ে আছে। তার মনে হয় যে, হাতে সময় খুব কম এবং সে বলে, আজিয়া নঅয়, আজিয়া অ'নে য'নগৈ, হালিয়া আইস্‌সন; তখন তার কথা শুনে তৈমুর আলি চমৎকৃত হয়, থামি এবং ব্লাউস পরা এই নিরাভরণ বালিকা নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে এবং বলে, কালিয়া কিয়া? রাতিয়া ধাই যাইবা না কোনো?

একথা শুনে সমর্ত বলে যে, সে রাতে পালাবে না, তৈমুর আলি তখন পুনরায় সমর্ত বানুর মুখের দিকে তাকায়, তার মনে হয় যে, ২য় শালিখের বদলে পাওয়া

এই রমণী আরাকানের জঙ্গলের মত সবুজ গভীর ও রহস্যময়; সমর্ত বলে রাতের বেলা সে ভেগে যাবে না, কিন্তু যদি যায়? সে বলে, ভাগি খড়ে যাইবা? আঁর নাম তৈমুর আলি, আঁই তুঁয়ারে খুঁজি বাইর কইরগম!

পরদিন রাতে তৈমুর আলি যখন জসিমউদ্দিন করাতির বাসায় আসে, তখন সে সমর্ত বানুর চালাকি বুঝতে পারে; কারণ সে দেখে যে, একদিন সময় পেয়ে সমর্ত তাদের বাড়ির ছোট ভিটার চারদিক বাঁশের কঞ্চি এবং বরইয়ের কাঁটা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে। তৈমুর আলি যখন বাড়িতে ঢোকার পথ পায় না, তখন সমর্ত বানু তার উপস্থিতি টের পায়, সে বলে, অ'নে আইস্‌সনদে না? এবং তৈমুর আলি যখন বলে যে, সমর্ত বানুই কি তাকে আজকে আসতে বলে নাই, তখন তৈমুর আলির সামনে সমর্ত তার ১ম চুক্তির প্রস্তাব দেয়। সে তাকে বলে যে, খুঁজে দেখলে ভিটায় প্রবেশ করার ৩টা পথ পাওয়া যাবে, এই ৩টা পথের একটায় গর্ত করে খরগোশ ধরার ফান্দ পাত' আছে, তৈমুর আলিকে এই ফাঁদ এড়িয়ে প্রবেশ করতে হবে; সে যদি তা না পারে, যদি সে ফান্দের গর্তের ভিতরে পড়ে যায়, তাহলে সে ফিরে যাবে এবং আর কোনদিন এমুখো হবে না।

তৈমুর আলির হয়তো মজা লাগে, সে এক কথায় রাজি হয় এবং ভিটার চারদিক চক্কর দিয়ে ভিতরে ঢোকার ফাঁক খোঁজে। সে অন্ধকারের ভিতর কয়েকবার পাক খায় কিন্তু কোন ফাঁক ফোকরই দেখে না, তার মনে হয় যে, সমর্ত বানু কাছেই আছে, কিন্তু যখন সে বলে, আঁর লগে চালাকি করন্দে না? তখন সমর্ত বানুর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ফলে আহম্মদ তৈমুর আলির রাগ এবং হতাশা বাড়ে তারপর সে সত্যি কাঁটার বেড়ায় তিনটা ফোকর খুঁজে পায়ঃ যে রাস্তাটা ক্ষেতের ভিতর দিয়ে এসে ভিটায় উঠেছে তার পাশেই একটা ফোকর, দ্বিতীয়টা ভিটার পিছন দিকে এবং তৃতীয়টা ভিটার ডান পাশে নদীর দিকে মুখ করা; তিনটা ফোকর-ই এত ছোট এবং নিচা যে, তার মনে হয় কুত্তা কিংবা শিয়াল ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে এর ভিতর দিয়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি, কথা মত তিনটা ফোকর ঠিকঠিক খুঁজে পাওয়ায় সে সমর্ত বানুকে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং তার মনে হয় যে, এখন তার কাজ হচ্ছে ফাঁদ পাতা নাই এমন একটা পথ বেছে নেয়া অথবা আরো সহজ হয় ফাঁদ পাতা পথটা খুঁজে বের করে অন্য দুইটা নিরাপদ রাস্তার যে কোন একটা দিয়ে এগোনো। সে ভিটার মূল রাস্তার কাছে ঘাসের উপরে বসে একটু জিরায় এবং বলে, তিয়া ওডি, আঁই আইর; তারপর সে তিনটা প্রবেশ পথের বিষয়ে দুইস্তর বিশিষ্ট শিকার-শিকারি খেলার একটা বিশ্লেষণ

দাঁড় করায়- সে হয়তো রেঙ্গুন, পেগু অথবা মান্দালয়ে থাকার সময় এসব শেখে। তার বিশ্লেষণটা ছিল এই রকম ঃ

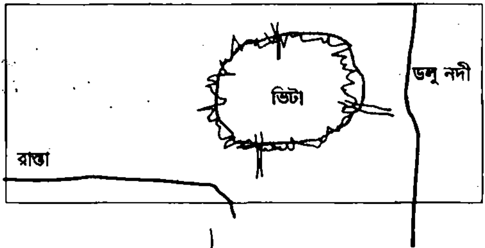


| পথ | বিশ্লেষণ-১ | বিশ্লেষণ-২ | সিদ্ধান্ত |
|---|---|---|---|
| ১নং পথ ভিটার সামনে | পথটা সরল সোজাসুজি সামনে, সে কারণে মনে হবে যে, এই রাস্তায়ই ফাঁদ পাতা আছে, কিন্তু যেহেতু এরকম মনে হবে তাই হয়তো এই পথে তা নাই, অন্য কোথাও আছে। | শিকার যেহেতু ভাববে যে এই পথের উপরে ফাঁদ নাই, অন্য কোথাও আছে, শিকারিও তা জানবে, তাই তা হয়তো এই পথেই আছে। | |
| ২নং পথ ভিটার পিছনে | পথটা আড়ালে ঢাকা, একটু দূরে ঘুরে যেতে হয়, মনে হবে যে, এই পথে ফাঁদ থাকবে না, এবং সে কারণেই হয়তো এখানে তা থাকবে। | যেহেতু মনে হবে যে, ফাঁদ এখানে থাকবে, সেহেতু এখানে তা নাই। | ভিটার পিছনের পথই নিরাপদ |
| ৩নং পথ ভিটার ডান পাশে নদীর দিকে | পথটা সামনে না হলেও ব্যবহৃত, নদীতে যাওয়ার জন্য এটার ব্যবহার আছে, সরাসরি না হলেও দিনের বেলা চলাচলের রাস্তা থেকে এটা দেখা যাবে,এসব কারণে মনে হবে যে, এই পথে ফাঁদ থাকতে পারে, নাও পারে। | ১নং আর ৩নং পথের মর্যাদা আসলে একরকম। হয় ১নং পথের উপরে ফাঁদটা আছে নয়তো ৩নং এর উপরে। যেহেতু মনে হবে যে, ১নং পথের উপরে ফাঁদ নাই, তাই তা আসলে ১নং পথের উপরেই আছে, ৩নং এর উপরে নাই। | |

গোলেনুর যখন কপালের দোষ দেয় তখন মনে হয় যে, সে হয়তো একেবারে ভুল বলে না; কারণ, জসিম করাতির ভিটার পিছনে বাঁশের কঞ্চি এবং বরইয়ের কাঁটা সরিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করা মাত্র তালাইয়ের উপরে হাল্কা করে মাটি ছড়িয়ে লেপে দেয়া আস্তরণ ভেঙ্গে তৈমুর আলি খাদের মধ্যে হুড়মুড় করে পড়ে যায়। তার কপাল খারাপ ছিল, তবে তা আরো খারাপ হতে পারতো, খাদের তলায় চোখা বর্শার মত বাঁশের টুকরা পুঁতে দিয়ে সমর্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যে মারণ ফাঁদ তৈরি করেছিল তৈমুর আলি বাঁশের সেই ফালিগুলোর ফাঁকের ভিতরে পড়ে; সে জানে বাঁচে, কিন্তু বেকায়দা হওয়ায় তার বাম পায়ের হাঁটুর চাকতি নড়ে যায়। গর্তের ভিতর পড়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য হয়তো সে অজ্ঞান হয়ে থাকে, তারপর জ্ঞান ফিরলে হাচরপাচর করে ভিটায় উঠে কুঁড়ে ঘরের কাছে গিয়ে বেড়ার গায়ে থাপ্পড় দেয়- সমর্ত বানুর চুক্তির কথা হয় সে ভুলে যায়, নয়তো মানে না। সমর্ত হয়তো তখন ঘরের ভিতর ঘুমিয়ে ছিল, কারণ সে নিশ্চিত ছিল তৈমুর আলি খাদে পড়বে; কিন্তু বেড়ার উপরে পিটাপিটির শব্দে তার ঘুম ভাঙ্গে, সে ঝাপ খুলে দেখে যে, দরজায় তৈমুর আলি দাঁড়িয়ে। সে রাতে অঙমেচিংয়ের মেয়ে সমর্ত বানু রক্ষা পায় না এবং সে রাতে আহম্মদ তৈমুর আলি চৌধুরির খঞ্জত্বের শুরু।

ভাঙ্গা পায়ের বিষয়ে আবার জিজ্ঞাস করা হলে গোলেনুর পুনরায় ভান করে, বলে, আঁই ন জানি। কিন্তু তাকে যখন বলা হয় যে, তৈমুর আলির পা কেমন করে ভাঙলো তা জানতে চাওয়া হচ্ছে না, তার পা কোন জায়গায় কতটা ভেঙ্গেছে তা জানতে চাওয়া হচ্ছে, তখন সে বলে, বহুত হষ্ট কইরগে বা'জি, তঅ পুরা ন সারে।

তৈমুর আলি সেদিন গর্ত থেকে উঠে সমর্ত বানুর সামনে যখন দাঁড়ায় তার তখন ভাঙ্গা পায়ের কথা খেয়াল হয় না, তারপর সেদিন রাতে অথবা পরদিন সকালে সে যখন আবার কাঁটার ফোকরের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসে তখন হয়তো সে তার পায়ের ব্যথা টের পায় এবং দেখে যে, সে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারছে না, তার বাম পায়ের হাঁটু ফুলে ঢোল হয়ে আছে। গোলেনুর এবং মওলা বকশ চৌধুরি সব কথা হয়তো জানে না, অথবা হয়তো জানে, না জানার কথা নয়; কিন্তু হুসনেআরা/মনোয়ারা/রশেনারাদের মত সমর্ত বানু গোপনে কান্দে কিনা তা কাঁটার বেড়ার ভিতরে বাস করার কারণে জানতে পারা যায় না এবং তার মা না থাকায় মওলা বকশের কাছে এসে কেউ চোখের পানিও ফেলে না। সমর্তের বাপ জসিমউদ্দিন করাতি লোহাগাড়ায় দুইদিন থাকে কিন্তু তৈমুর আলিকে না দেখে আর অপেক্ষা না করে সাতকাইন্যা ফিরে আসে, কারণ মা মরা মেয়ে সমর্ত

বানুর জন্য তার দুশ্চিন্তা হয়; এবং সে এসে দেখে যে, বরইয়ের কাঁটা দিয়ে বাড়ির চারদিক ঘেরা দেয়া, ভিতরে ঢোকার রাস্তা নাই। তারপর সে সমর্তকে ডাকে এবং সমর্ত ঘর থেকে বের হয়ে এলে হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভিটায় প্রবেশ করে।

তারপর সমর্ত বানুকে কাঁটার বেড়া দেয়া ভিটার বাইরে আর দেখা যায় না, কিন্তু তৈমুর আলি মিঞার ভাঙ্গা পা পাকে এবং ফোলে, ব্যথা এবং জ্বরে অস্থির হওয়ার পর তাকে গরুর গাড়িতে করে দোহাজারির গাছবাড়িয়ায় ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগানোর কবিরাজ শ্যামাপদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্যামাপদ তার ঝুপড়ির বাইরের ঘরে তৈমুর আলিকে রেখে দশ/বিশ/ত্রিশ দিন ধরে চিকিৎসা করে, সে প্রথমে তোকমার পুলটিশ লাগিয়ে পেকে ফুলে ওঠা হাঁটু ফাটিয়ে পুঁজ বের করে এবং হাঁটুর চাকতিটা চেপে চেপে ঠিক জায়গায় বসিয়ে ক্ষতস্থান কালোমেঘের পাতা সিদ্ধ করা পানি দিয়ে ধোয়, তারপর মটমটি লতা বেটে ক্ষতের চারদিকে লাগিয়ে দেয়। শেষে পরিষ্কার ন্যাকড়া জড়িয়ে বেঁধে, অর্জুন গাছের ছাল, মহানিম বা ঘোড়ানিমের বিচি এবং লজ্জাবতীর শিকড় বেটে কিংবা সিদ্ধ করে বানানো অরিষ্ট তাকে দুই বেলা দেয় পান করার জন্য। প্রতিদিনের পরিচর্যায় এবং মটমটির মলম লাগিয়ে ও নিয়মিত শ্যামাপদের বানানো ওষুধ খেয়ে তৈমুর আলির পায়ের ক্ষত শুকিয়ে আসে।

গোলেনুর এসব হয়তো জানে এবং সে বলে যে, তৈমুর আলি এক শালিখ দেখার পর বড় ফাড়া থেকে বাঁচে, দোহাজারি থেকে সে দুই বোতল তিতা স্বাদের অরিষ্টসহ ফিরে আসে এবং সকাল বিকাল কাঁসার গ্লাসে করে এই ওষুধ খায়। তারপর অনেকদিন তার এই কষ্ট নিয়ে কাটে, একমাস/দুইমাস/ছয়মাস, লোক গিয়ে শ্যামাপদের নিকট থেকে আরো ওষুধ আনে; এবং এভাবে সে তার পায়ের উপর পুনরায় খাড়া হয় বটে কিন্তু জখম কঠিন এবং চিকিৎসায় দেরি হওয়ায় অথবা যে কারণেই হোক, সে লুলা বা খোঁড়া বা ভেঙ্গুর হয়ে যায়!

তখন একদিন সমর্ত বানু মওলা বকশের বাড়িতে আসে; গোলেনুরকে জিজ্ঞাস করলে মনে হবে যে, সে এই বিষয়ে কিছুই জানে না, যদিও আসলে সে জানে- তখন তৈমুর আলি একটু একটু করে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছে, এই সময় সে, সমর্ত, আসে। তার এতদিন কোন খবর ছিল না, কিন্তু তৈমুর আলির খঞ্জত্ব নিশ্চিত হওয়ার পর একদিন সে এসে হাজির হয় এবং তৈমুর আলির সঙ্গে তার দেখা হয়, কারণ সেতো তাকে দেখতেই আসে, এবং সে তৈমুর আলিকে জিজ্ঞাস করে, অ'নে ক্যান আছন? অ'নেরে আঁই চাইবার লাই আইস্‌সিদে!

তৈমুর আলি তখন দেখে যে, সমর্তের চোখে তরল আলো এবং ঠোঁটে চাপা হাসি খেলা করে, সে বলে, তুঁই আঁর লগে বেঈমানি কইরগো!

দেখা যায়, বেঈমানির বিষয়ে তাদের অভিযোগ ছিল পারস্পরিক; তৈমুর আলির কথা শুনে সমর্ত বলে যে, তৈমুর আলিই তার কথা রাখে নাই, এবং সে যে কথা রাখবে না তা সে জানতো। গোলেনুরকে হয়তো পুনরায় এসব বিষয় জিজ্ঞাস করা যায়, যদিও লাভ নাই; এসব বিষয়ে গোলেনুর যে কথা বলে তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, তৈমুর আলির শালিখ দেখাটাই ছিল এক দুর্ভাগ্য এবং সে ক্রমে এই জালে জড়িয়ে যেতে থাকে; তৈমুর আলি অবশ্য নিশ্চিত ছিল যে, সমর্ত তার সঙ্গে প্রতারণা করেছিল, তার পা ভেঙ্গে দেয়ার ব্যাপারে সে বদ্ধপরিকর ছিল; তবে এখন সমর্তের কথা শুনে তার রাগ হয়তো প্রশমিত হয় এবং সে বলে, ইত্তার ক্যান করিবাদে?

এই কথার উত্তরে তখন সমর্ত যা বলে তাতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়, সমর্ত বলে যে, সে এখন আলিকদম যাবে। তৈমুর আলিরতো জানা ছিল সমর্ত আলিকদমে কোথায় যেতে চায়, তবু সে জিজ্ঞাস করে, আলিকদম খডে?

- অ'নে ন জানন, খডে?

তৈমুর আলির প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা তার কোন ব্যাপার না, কিন্তু অতিদ্রুত সে দেখতে পায় যে, সুরত জামালের কথায় তার অন্তর পুড়ে খাক হয়; এটা হয়তো ঈর্ষা ছিল, হয়তো বিদ্বেষও। গোলেনুর অবশ্য বলে যে, সে এসব কিছু জানে না; সে বলে, কো'য়াল বা'জি! কিন্তু তারপর সে বলে যে, সবকিছুই ছিল সমর্ত বানুর পাতা ফাঁদ, একটা মগের মূর্খ মেয়ে কেমন করে গ্রামের সবচাইতে সমর্থ ও উপযুক্ত পুরুষটাকে ধরে এটা ছিল তার একটা নমুনা; আক্ষরিক অর্থে সমর্ত বানুর পাতা ফান্দের গর্তে পড়ে যাওয়ারও আগে, যখন ডলু নদীর কিনারায় তার সঙ্গে দেখা হয় তৈমুর আলি তখনই যাদুর জালে আটকা পড়ে, কারণ সমর্ত হচ্ছে আরাকানের অঙমেচিংয়ের মেয়ে এবং তারও একটা মগ নাম আছে, এলাচিং। এই মেয়ের খপ্পরে পড়ে যায় তৈমুর আলি; সমর্ত বানু বা এলাচিং সব কিছু পরিকল্পনা করে ঘটায়; এবং গোলেনুর বলে, মাইয়া ফোয়া ইবা গম নঅয়!

ফলে সমর্ত বানুর আর একটা নাম জানা যায়, এলাচিং, তবে হয়তো গোলেনুরের অন্য কথাটা ঠিক না, এলাচিং হয়তো তেমন খারাপ মেয়ে ছিল না, কারণ, এক শালিখ দেখা থেকে এসব কিছুর শুরু এবং সমর্ত বানু বা এলাচিং তৈমুর আলিকে যাদুর জালে হয়তো আটকাতে চায় নাই। অথবা হয়তো চেয়েছিল, বোঝা মুশকিল; হয়তো গোলেনুরের কথাই ঠিক, এলাচিং ভেগে না গিয়ে তৈমুর আলির কাজকারবার সহ্য করে, কিন্তু আবার শর্ত দিয়ে তার জীবন বেঁধে রাখে, ঘুরায়, এ ছিল এক এলোমেলো ব্যাপার! তৈমুর আলি ১ম চুক্তি করার পর ল্যাংড়া হয়ে যায় এবং ২য় চুক্তি করে লম্বা রেশমের অদৃশ্য সুতার আগায় ঝুলন্ত মাকড়শার মত সারা জীবন লটকে থাকে এবং শেষে এর আগামাথা না বের করতে পেরে

মরে। একদিন যখন নাস্তার সময় তার বেগুন অথবা পেঁপে অথবা পটল অথবা অন্য কিছুর ভাজিতে অরুচি হয় এবং এলাচিং যায় চিনি আনতে, সে দুইটা গ্লাসের সব পানি খেয়ে নেয়। তখন এলাচিং চিনি নিয়ে ফিরে এসে দেখে যে, তৈমুর আলি খাটের ওপর নাস্তার আয়োজনের পাশে লম্বা এবং চিৎ হয়ে শোয়া, তার চোখ বন্ধ, দুই হাত বুকের উপরে ভাঁজ করে রাখা; তার বুক হাপরের মত বাড়ি খায় এবং কপাল ও নাক ঘামে চিকচিক করে- এলাচিং দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

তৈমুর আলি মনে হয় যেন ২য় চুক্তির শর্তও ভঙ্গ করে; ভাঙ্গার জন্যই চুক্তি করার বিষয়টা পরিণতিতে ভাল ফল বয়ে না আনলেও সে এলাচিংকে পায় এবং এলাচিং তাকে দেয় ১২টা সন্তানের পাশাপাশি অলৌকিক চুক্তির বেড়াজাল। তৈমুর আলি তার খঞ্জত্বের জন্য পুরাপুরি এলাচিংকে দায়ী করলেও, এলাচিং তারপর আলিকদম যাওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছিল; তখন আর একবার তার লোভ, ঈর্ষা এবং হয়তো ক্রোধ তাকে বশ করে। এলাচিং যেদিন তৈমুর আলির ভাঙ্গা পা দেখতে আসে সেদিন বিকালে অথবা পরদিন সকালে সে জসিম করাতির নদীর কিনারার বাড়িতে যায় এবং দেখে যে, বাড়ির ভিটা আগের মতই কাঁটা দিয়ে ঘেরা, ভিতরেও যেতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। এই দিন হয়তো সে ভিতরে যেতে ভয় পায় অথবা হয়তো ভাঙ্গা পায়ের কারণে হামাগুড়ি দিতে পারে না; ভিটার নিচে দাঁড়িয়ে সে এলাচিংকে ডাকে।

তৈমুর আলি যখন বলে, কোথায় পালাবে তুমি মগের মেয়ে এলাচিং? - এলাচিং ঘরের ভিতরে চুপ করে থাকে, কথা বলে না।

তৈমুর আলি যখন বলে, আলিকদম তুমি কেন যাবে আমাকে খুলে বলো, আলিকদমতো তোমার যাওয়া হবে না, - তখনও এলাচিংয়ের সাড়া পাওয়া যায় না।

তৈমুর আলি যখন বলে, আমিতো তোমাকে ছাড়ব না মেয়ে, - এলাচিংয়ের কথা শোনা যায় না।

তৈমুর আলি যখন বলে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, ঘর থেকে বের হও,- এলাচিং ঘরের ভিতরেই বসে থাকে।

তৈমুর আলির তখন আবার রাগ হয় এবং সে বলে, ওডি কানে ন হুনোদ্দে না? - এলাচিং তারপরও কানে না শুনে থাকে।

তখন তৈমুর আলির রাগ হয়তো আরো বাড়ে, সে বিকট চিৎকার করে, তোমার মুক্তি নাই আমার হাত থেকে, এবং তারপর সে যখন সেই কথাটা বলে, আঁই তুঁয়ারে ন ছাইড়গম, আঁই তুঁয়ারে বিয়া কইরগম, - তখন এলাচিং তার ঝুপড়ি ঘর থেকে বের হয়ে ভিটার কিনারায় কাঁটার বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। তখন

পুনরায় মনে হয়, গোলেনুরের কথা হয়তো ঠিক, কারণ, তখন এলাচিংকে দেখে মনে হয় যে, সে তৈমুর আলির আগমনের জন্য তৈরি হয়ে বসে ছিল; অথবা তা হয়তো ঠিক না, তবু তখন তাকে খুব পরিপাটি লাগে, তার পরনে ছিল উজ্জ্বল হলুদ রঙের থামি এবং তার উপরে লাল ছিট কাপড়ের ব্লাউস- পিঠের ওপর ছেড়ে দেয়া ছিল ভ্রমর কালো চুল। আকিয়াব, রেঙ্গুন এবং মান্দালয় ফেরত তৈমুর আলি কাঁটার বেড়ার ভিতর দিয়ে তাকে দেখে, এটা হয়তো ছিল এক যাদুময় ক্ষণ এবং সে তার লোভ, ঈর্ষা বা ক্রোধের বাইরে এসে হয়তো একবার সমর্ত বানু বা এলাচিংয়ের দিকে তাকায়; তখন হয়তো তার মনে হয় যে, এই মেয়ে যাবে সুরত জামালের কাছে! সেদিন, তখন বা একটু পরে এলাচিং তার পরিণতি মেনে নেয় এবং তৈমুর আলিকে তার আঙ্গুলের হীরার আংটিটা দেখায় এবং তাদের ২য় চুক্তির শর্তাবলী বর্ণনা করে। তৈমুর আলি হয়তো সব কথা ঠিক মত শোনে না, অথবা হয়তো শোনে কিন্তু এলাচিংয়ের ফান্দে পড়ে পা ভাঙ্গার কথা হয়তো তার মনে থাকে না, তাই হয়তো তার কাছে বিষয়টা ইয়ার্কি অথবা ছেলেখেলা বলে মনে হয় এবং সে বলে, আঁই রাজি আছি।

বস্তুত এলাচিংয়ের একাধিকবার বিড়াল মারা সত্ত্বেও হীরার আংটির বিষয়টা হয়তো তৈমুর আলির বিশ্বাস হয় নাই, বিশেষ করে যখন প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই খেলা চলে এবং সঠিক গ্লাসটা চিনে নিতে তার একবারও ভুল হয় না, তখন তার সন্দেহ একরকম বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়- তার মনে হয় যে, কোথাও জারিজুরি আছে, এলাচিং আগেও মিথ্যা বলেছে হয়তো এখনো বলে। কিন্তু এই সন্দেহের জন্য অথবা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে কিংবা হয়তো পিপাসার কারণেই দুইটা গ্লাসের সব পানি খেয়ে ফেলার পর যেদিন তৈমুর আলি খাটের উপরে সটান হয়ে শুয়ে পরে, এলাচিং তস্তরিতে চিনি নিয়ে ফিরে এসে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারে; তখন সে দ্রুত বের হয়ে গিয়ে বাড়ির সকলকে খবর দেয়। তারপর থানার পাশের ডিসপেনসারি থেকে মোজাহার ডাক্তারকে ডেকে আনা হয়, কিন্তু ততক্ষণে তৈমুর আলির বুকের ওঠানামা থেমে গেছে এবং মোজাহার ডাক্তার পরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করে। মোজাহার ডাক্তার একটা ডেথ সার্টিফিকেটও দেয়, তাতে সে লেখে যে, তৈমুর আলি আকস্মিকভাবে প্রবল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, ফলে এলাচিংয়ের আংটির গল্প সত্যি কিনা তৈমুর আলির মৃত্যুর পরও তার সুরাহা হয় না। কিন্তু তৈমুর আলির মৃত্যুর পর তার চল্লিশা হয়ে গেলে এলাচিং একদিন সবার ছোট ছেলে মিরাজ আলি চৌধুরিকে ডেকে বলে, আঁই আলিখদম যাই থাইক্কম, আঁরে আলিখদম রাখিয়েওে আইয়ো।

তখন ছেলেরা আলিকদম বাসস্ট্যান্ড ও বাজারের মধ্যবর্তী জায়গায় তাদের বাড়িতে একটা পাকা ঘর বানিয়ে মোটর গাড়িতে করে একজন কাজের মেয়েসহ

এলাচিংকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসে। যাওয়ার সময় এলাচিং তার বার্ধক্যপীড়িত শুকিয়ে আসা আঙুল থেকে ঢিলা হয়ে যাওয়া আংটিটা খুলে মিরাজ আলিকে দেয়, বলে, রাখি দঅও, ইবা হীরা; তারপর সে, আরাকানের অঙমেচিংয়ের মেয়ে এলাচিং ওরফে সমর্ত বানু, আলিকদম রওনা হয়।

এলাচিংয়ের হীরার আংটিটা মিরাজ মিঞার কাছে থাকে, তারপর একদিন মিরাজ আলি চৌধুরি চট্টগ্রাম শহরে তার দুই বন্ধু হুমায়ুন কবির এবং গোলাম ফেরদৌস কাসেমকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা প্যালেস হলের কাছে হাজারি গলিতে মেসার্স এসবি জুয়েলার্সে যায়। এসবি জুয়েলার্সের মালিক, সোনারূপার ঝানু কারবারি, জ্যোতিভূষণ দাস তখন দোকানেই বসা ছিল; মিরাজ আলি এবং তার বন্ধুরা তখন গিয়ে তাকে জিজ্ঞাস করে যে, সে একটা হীরার আংটি কিনবে কিনা। জ্যোতিভূষণ তার ব্যবসার জীবনে হীরা দেখলেও তার কেনাবেচা করে নাই, তবে সে হীরা চেনে মনে হয়; হাজারি গলির এই চিপা রাস্তায় কেউ হীরা বেচতে আসবে তার তা বিশ্বাস হয় না, তবু সে বলে, ন কিন্নম কিয়া, এবং তখন মিরাজ আলি তার প্যান্টের পকেট থেকে সাদা টিসু কাগজে জড়ান আংটিটা বের করে দেয়। জ্যোতিভূষণ পাকা জহুরির মত আংটিটা বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে; দরজার আলোর দিকে তুলে ধরে দেখে আলো বিচ্ছুরিত হয় কতটা, হাতলওয়ালা গোল ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের নিচে রেখে দেখে পাথরটার প্রান্তগুলা কতটা মসৃণ, খোঁজে সেখানে কোন সূক্ষ্ম ভাঙ্গা খাঁজ আছে কিনা, তারপর শোকেসের কাচের উপর আঁচড় কেটে বলে, ইবা হীর্‌্যা নঅয়, ইবা খাচ!

বন্ধুদের কাছে মিরাজ মিঞা চৌধুরির ইজ্জত থাকে না, তবু তারা হয়তো আরো দুই এক জায়গায় চেষ্টা করে, হয়তো আন্দরকিল্লা অথবা বিপনি বিতানে, তারপর, এটা হীরা নয় কাচ জানা হয়ে গেলে আংটিটার উপর তার মায়া দেখা দেয় এবং সে এলাচিংয়ের হীরা অথবা কাচের এই আংটি পকেটে ফেলে সাতকানিয়া ফেরে।

২০০৩

# আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস

আমাদের মহল্লা, দক্ষিণ মৈশুন্দির শিল্পায়নের ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে; মহল্লায় গরম পড়তে শুরু করলে চৈত্র, বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে এবং আমরা তরমুজ খেতে শুরু করি, আমরা তখন তরমুজ সম্পর্কে সচেতন হই; আমরা লক্ষ করি যে, এই তরমুজওয়ালারা মহল্লার গলির সংকীর্ণ একটি জায়গায় মাটিতে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে, গোল গোল তরমুজের ছোট ছোট ঢিবি বানিয়ে বসে, তারা এই জায়গায় কেন বসে আমরা বুঝতে পারি না, ফলে এই জায়গায় এসে রিকশা, ঠেলাগাড়ি, গরুর গাড়ি, বেবিটেক্সি, কুকুর, বেড়াল, ছাগল এবং মানুষ একটি জট পাকিয়ে ফেলে; দক্ষিণ মৈশুন্দিতে মাছি বেড়ে যায়, আমাদের নাকের ওপর সেগুলো এসে বসে, নীল মোটা মাছি এবং কালো সরু মাছি, ফলে আমরা বিরক্ত হই; আমরা তাদেরকে বলি, তুমরা এই মাছির দিনে তরমুজ লয়া আহ ক্যালা! বাবুল মিয়া অথবা দুলাল, অথবা বাবুল মিয়াই একটা ফুটবল নিয়ে এলে এতক্ষণ রাস্তার ওপরে হৈচৈ করতে থাকা বালকেরা তার পিছন পিছন গ্রাজুয়েট স্কুলের দিকে চলে যায়, তখন মহল্লায় নীরবতা নামে এবং আমরা বুঝতে পারি এতক্ষণ আমরা কী যন্ত্রণার ভেতর ছিলাম এবং তখন এই নীরবতার ভেতর আমরা মহল্লায় লেদ মেশিন চলার শব্দ শুনতে পাই; আমাদের তখন মহল্লার ইতিহাস মনে পড়ে, আমরা তরমুজ সম্পর্কে বিশদ/বিস্তারিত জানতে পারি, আমরা দুই হাতের তালুর ভেতর তরমুজ ধারণ করে এর ওজন পরখ করতে শিখি, এবং ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হাতের ভেতরকার তরমুজের ওজনের সঙ্গে এর অন্তর্গত গুণের বিষয়টির যোগসূত্র

অনুধাবনে পারঙ্গমতা অর্জন করি, আমরা মুণ্ডিত মস্তকের মতো এর চকচকে গায়ে আলতো করে কর স্থাপন করে এই জিনিসটি বোঝার চেষ্টা করি যে, এই ফলটির দেহ সতেজ এবং ভেতরের রসালোভাব অক্ষুণ্ন আছে কিনা; আমরা তরমুজওয়ালাকে জিজ্ঞেস করি, তরমুজের দিনে মাছি হয়, না, মাছির দিনে তরমুজ; তখন মহল্লার বালকেরা ফিরে আসে, কারণ, তাদের তখন ইচ্ছে করে মহল্লার রাস্তায় গোল্লাছুট খেলতে এবং ফলে আমরা মহল্লার কাচের কারখানার চুল্লির আগুনের চাপা শব্দ আর শুনতে পাই না; এই অবসরে আমরা তরমুজ কাটি এবং তরমুজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ে সমৃদ্ধ হই, গাঢ় সবুজ রঙের চামড়ার নিচে তরমুজের ভেতরটা হবে সাদা, কখনো কখনো গোলাপি, কিন্তু মূলত সাদা, এবং যে তরমুজের গায়ের রঙ ফেকাসে সাদা অথবা ছিটকাপড়ের মতো, তার ভেতরটা হবে রক্তের মতো লাল, আমরা তখন তরমুজওয়ালাদের কাছে জানতে চাই, তরমুজ দুই রকমের কেন হয়; কারণ, আমাদের সামনে তরমুজ নির্বাচনের এই সঙ্কট উপস্থিত হয়, যা আমাদের পিতাদের ছিল না, তরমুজ তখন, সে সময়, এক রকমের ছিল; তারা এরকম বলেন, যেমন আমরা বলি, গরম পড়তে শুরু করলে তরমুজওয়ালারা তরমুজ নিয়ে আসে, তখন মহল্লায় মাছি বেড়ে যায় এবং আমরা তরমুজওয়ালাদের বলি, মিয়ারা মাছির দিনে তরমুজ লয়া আহ ক্যালা! তখন হাজি আব্দুর রশিদ তার লেবেঞ্চুশ কারখানার নির্মাণ কাজের জন্য বালু এনে মন্দিরের সামনের রাস্তার ওপর ফেলে এবং মহল্লার বালকেরা মন্দিরের দেয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে, নিচে, বালুর স্তূপের ভেতর লাফিয়ে পড়ে; হৈচৈ-এর কারণে আমাদের তন্দ্রা ছুটে যায় এবং তরমুজ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি, আমরা তখন চাকু অথবা বটি অথবা দা দিয়ে তরমুজ কেটে খাই, রাস্তায় বালকেরা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গোল্লা ফেলে রেখে বাড়ি ফেরে; আমরা এই বিষয়টি খেয়াল করতে পারি না যে, আমরা তরমুজের সঙ্গে অনেক বিচি খেয়ে ফেলি, সেজন্য, অথবা বেশি পরিমাণে তরমুজ খাওয়ার কারণে আমাদের পেটের ভেতরটা মোচড় দেয়, আমরা তরমুজওয়ালার কাছে যাই এবং বলি, তরমুজে বিচি হয় ক্যালা! তখন মহল্লায় লেদ মেশিনের শব্দ থেমে যায় এবং আমরা বিষণ্ন হয়ে পড়ি, কারণ, আমাদের তখন মনে হয় যে, তরমুজের বিচির জন্য আমরা মহল্লায় হয়তো একটি গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ব; আমরা জানতে পারি যে, তারা, অর্থাৎ আমাদের পিতারা, তখন তরমুজ খায়, গাঢ় সবুজ চামড়ার ওপর পিরামিডের মতো সাদা ফালি, এবং তারা কালো কুচকুচে বিচি খেয়ে ফেলে, ফলে মহল্লার ইতিহাস আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়; তারা বলে,

আমরা যা জানি না তা, এবং যা জানি তা পুনরায়; হাজি আব্দুর রশিদের পেটে মোচড় দিলে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং ভাবেন, আম কত রকমের হয় কিন্তু তরমুজ কেবল এক রকমের হয় কেন, সেই সময় অন্ধকার ঘরের ভেতর শুয়ে তিনি বুঝতে পারেন যে, তার ছেলে আব্দুল জলিলের জন্য একটি লেদ মেশিন বসানো দরকার; এবং এভাবে আমরা তরমুজ খেয়ে যখন জিরাই তখন মহল্লায় নাটবল্টু তৈরির ইতিহাস আমাদের মনে পড়ে এবং আমরা তখন মহল্লার একমাত্র কবি, একমাত্র প্রেমিক, একমাত্র ঘরপলাতক নারী এবং একমাত্র আত্মহত্যার ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারি; তরমুজের বিচি খেয়ে ফেলার পর পেটে যে ব্যথা হয়, সেই ব্যথার ভেতর হাজি আব্দুর রশিদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত হয় এবং তিনি মহল্লায় লেদ মেশিনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারেন এবং তার মনে হয় যে, নিঃসন্তান বিধবা, বৃদ্ধা রহিমা বিবির দেড় কাঠার বাড়িটা তার প্রয়োজন; আমরা তখন জিরাতে জিরাতে আমাদের পেটের ব্যথার কথা ভাবি এবং আমাদের আক্ষেপ হয় এই জন্য যে, এই গরমের ভেতর তরমুজই যদি খেতে না পারি তাহলে আমরা আর কী খাব! তরমুজ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বাড়ে, কারণ, তরমুজের রসের গন্ধে মাছি বেড়ে যায় এবং মাছি আমাদের নাকের ভেতর প্রবেশ করে; আমাদের হাঁচি হয় এবং আমরা হাঁচি দেয়ার শারীরিক-যৌন আনন্দকে আবিষ্কার করি, আমাদের জীবনে তিনটি জিনিস আমরা সনাক্ত করতে পারি, লেদ মেশিন, তরমুজ এবং মস্তিষ্কের শেকড়ের গোড়া থেকে উঠে আসা হাঁচি দেয়ার আনন্দ; আমাদের মনে পড়ে মহল্লার ভেতর শেফালি আখতারের বেড়ে ওঠার ঘটনার কথা, সে যেদিন নিখোজ হয় অথবা বাড়ি থেকে পালায়, তার জন্য আমাদের কষ্ট হয়; আমরা মনে করতে পারি যে, সেটা ছিল আব্দুল গফুরের সর্বশেষ পতন, আমাদের মনে হয় কাঁখের পিতলের কলস পড়ে যাওয়ার মতো আমরা এই পতনের শব্দ শুনতে পাই, এজন্য আমাদের কোনো আনন্দ কিংবা দুঃখ হয় না, আমাদের মনে হয় যে, এই পতন অনিবার্য ছিল; কারণ, ঘটনাটা আমাদের কৈশোরেই ঘটে, হাজি আব্দুর রশিদ তরমুজের বিচি খেয়ে ফেলার পর তার পলেস্তারা খসা চুন-সুরকির দালানের আধো-অন্ধকারের ভেতর হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে শুয়ে থাকার সময় সেই স্বপ্নটি দেখেন এবং তার সেজ ছেলে আব্দুল জলিলকে ডেকে পাঠান, এবং আমরা জানতে পারি তরমুজের বিচি খেয়ে ফেলার পর হাজি আব্দুর রশিদের চোখের সামনে কী করে মহল্লা এবং দেশের ভবিষ্যৎ ভেসে ওঠে এবং পরবর্তীকালে আমরা যখন বিচি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমরা বিচলিত হই এই কারণে যে, মহল্লায় আমরা লেদ মেশিনের শব্দ থেমে

যেতে শুনি এবং আমাদের আশঙ্কা হয় যে, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি মালিক সমিতির দক্ষিণ মৈশুন্দি শাখার সভাপতি আলমগীর হোসেনও হয়তোবা অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং পরবর্তী শুক্রবার দোলাইখাল এলাকায় উপপ্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর যে ভাষণ দেয়ার কথা সেই ভাষণে একই সঙ্গে দক্ষিণ মৈশুন্দির নাম ঢুকিয়ে দেয়া হয়তো তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না, কিন্তু তরমুজ সম্পর্কে আমাদের জানার বাকি ছিল; আমাদের এরকম মনে হয় যে, আমাদের পিতারাই সুখী ছিল, কারণ, তাদের জীবন সরল ছিল, তাদের সম্মুখে দুই রকমের তরমুজ থেকে একটি বেছে নেয়ার সঙ্কট ছিল না; আমরা জাপানি লাল তরমুজ খাই, কিন্তু আমরা নিশ্চিত হতে পারি না এটা লাল তরমুজই কিনা, ফলে আমরা তরমুজের বিচি খেয়ে ফেলি এবং হাজি আব্দুর রশিদ বিছানায় শুয়ে তার তিন নম্বর ছেলে আব্দুল জলিলকে ডেকে পাঠান এবং সে এলে, মহল্লায় লেদ মেশিন বসানোর কথা বলেন, কিন্তু তার লজেঞ্চ কারখানার সঙ্গে লাগানো রহিমা বিবির বাড়িটি তার দখলে আসে না, এই বৃদ্ধা কেন এরকম করে তা আমরা বুঝতে পারি না; তখন একদিন দোহার থেকে অথবা নবাবগঞ্জ থেকে আব্দুল গফুর এসে হাজির হয়, তার সঙ্গে তার তিন ছেলেমেয়ে আসে, আমরা জানতে পারি যে, সে, আব্দুল গফুর, রহিমা বিবির বোনের ছেলে এবং রহিমা বিবি তার বাড়িসহ জায়গা আব্দুল গফুরকে হিবাদলিল করে দান করে; এই ঘটনার সঙ্গে আমাদের মহল্লার শিল্পায়নের ইতিহাস বদলে যেতে পারতো, কিন্তু আমাদের তখন এরকম সন্দেহ হয় যে, আমাদের পেট মোচড়ানোর ভাবটা বেশ কঠিন এবং গভীর, এবং তখন হাজি আব্দুর রশিদ তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রেরণা ফিরে পান; এই কথা যখন আমরা জানতে পারি, আমরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ি, কারণ, আমরা বুঝতে পারি যে, গরুর গাড়িতে করে শিগগিরই মন্দিরের সামনে বালু এনে ফেলা হবে, আমরা এই সময়টির জন্য প্রতীক্ষায় থাকি, এবং আমরা তখন শেফালিকে দেখতে পাই, আমাদের মনে পড়ে যে, শেফালি একটি ফুলের নাম, আমরা মাঝারি আকৃতির হালকা পাতলা আব্দুল গফুরকে দেখে বুঝতে পারি যে, মটর পার্টসের অথবা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকানদার হিসেবে তাকে খারাপ লাগবে না দেখতে, কিন্তু মাছি সম্ভবত তাকে বিরক্ত করে ফেলে, ফলে আমরা দেখি যে, সে আমাদের ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে এবং নারিন্দা প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারি শুরু করে, তখন আমরা তার বড় ছেলে আজিজুল হক এবং ছোট ছেলে আমিনুল হককে দেখি; আমরা দাঁতে কেটে নিয়ে তরমুজের টুকরো জিভ দিয়ে তালুর সঙ্গে ঠেসে ধরি, গরম এবং খরার দিনে তরমুজ খাওয়ার সময় আমাদের যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দের ভেতর আমরা শেফালির বেইমানির কথা

ভুলতে পারি না, আমরা সেই মানুষটিকে বের করতে পারি না যার সঙ্গে সে চলে যায়, এবং আমাদের মনে হয় যে, একই মহল্লায় থেকে সে আমাদের ঠকায়, কারণ, হয়তোবা সে তরমুজ খাওয়াকে ঘৃণা করতে শেখে তার পিতা, আব্দুল গফুরের কাছ থেকে; কিন্তু তখন আমরা আলমগীর হোসেনের কথা জানতে পারি, আমরা জানতে পারি যে, পেট মোচড়ানোর কারণে শুয়ে থাকার যে অবসর সে পায়, সেই সময়টি আমাদের জন্য বড় আশীর্বাদের মত হয়ে ওঠে, তখন আমাদের শেফালির কথা মনে পড়ে, তার কথা মনে হলে আমাদের, অর্থাৎ দক্ষিণ মৈশুন্দির লোকদের ঝর্ণা বসাকের কথা মনে পড়ে এবং আমাদের এক প্রকারের দুর্বোধ্য শোক হয় এবং হাজি আব্দুর রশিদ নির্মাণ কাজের জন্য মন্দিরের সামনে বালু এনে ফেললে সকাল বেলা বাবুল মিয়া এবং তার দল বালু নিয়ে খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে; তারপর আমরা ঘরে ফিরি এবং আমাদের মায়েরা, হায় আল্লা অখনতরি ইস্কুলে যাসনিকা, বলে তেড়ে এলে আমরা আমাদের মলিন খাতা এবং পাতা ছেঁড়া বই নিয়ে দৌড় দিই; এখানে এই গ্রাজুয়েট হাই স্কুলে আমরা আজিজুল হক এবং আমিনুল হককে পাই এবং একটি বিষয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য স্থাপিত হয়, যখন আমাদের স্কুলের পিটি টিচার ননি বসাক পিটির লাইনে আমাদের কান মলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজিজুল হক এবং আমিনুল হকেরও কান মলে দেয়; আমরা তখন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরি, কিন্তু শেফালির জন্য আমাদের বহুদিন মন খারাপ থাকে, আমরা বুঝতে পারি না, তবু থাকে, আমরা তাকে ফুল বলে ডাকি, এই শেফালি ফুল; সে বাংলাবাজার স্কুলের ফিরোজা রঙের ইউনিফর্ম গায়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসে এবং বলে, শেফালি ফুল নাকি? আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, মহল্লায় বহুদিন আমরা ফুলগাছ দেখি নাই এই কথাটি আমরা স্মরণ করতে পারি এবং আমাদের মনে হয় যে, শেফালি কি ফুল নয়, গাছ? আমরা তখন আমাদের কথা সংশোধন করি, এই শেফালি গাছ; এবং তখন সে আমাদের জীবনের সম্ভবত প্রথম সমস্যাটি উপস্থিত করে, কারণ, সে আবারও হাসে এবং বলে, শেফালি কি গাছ? আমরা পুনরায় বিভ্রান্ত হই এবং খবর পাই যে, রহিমা বিবির জায়গাটুকু না পেলেও হাজি আব্দুর রশিদ মহল্লায় লেদ মেশিন বসানোর পরিকল্পনা ত্যাগ করে নাই, তরমুজ অথবা তরমুজের বিচি খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকার সময় সে তার পরিকল্পনার ছক গুছিয়ে নেয় এবং তরমুজ সম্পর্কে আমরা আরো সচেতন হই, কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের জীবনে অবসরের সঙ্গে এই ফলটির সম্পর্ক কত নিবিড়; 'মেশিনটুলস ফ্যাক্টরি মালিক সমিতি'-র আলমগীর হোসেন যখন তরমুজ অথবা তরমুজের বিচি খেয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে

তার তখন হাজি আব্দুর রশিদের তরমুজ খাওয়া এবং পেট মোচড়ানোর কারণে শুয়ে থাকার এই ঘটনাটির কথা স্মরণ হয়, এবং বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে তার কথাগুলো সাজিয়ে নেয়, অথবা লিখে ফেলে, কিন্তু আমরা জানতে পারি যে, উপপ্রধানমন্ত্রীর ভাষণে হাজি আব্দুর রশিদের তরমুজের বিচি খাওয়ার এই ঘটনার কথা অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; শুক্রবার বাদজুম্মা অনেকে দোলাইখাল এলাকায় যায় এবং সাদা পাঞ্জাবি ও কিস্তিটুপি পরা উপপ্রধানমন্ত্রীকে ছোট ছোট লেদ কারখানায় উঁকি দিতে দেখে, তারপর তারা তার বহু প্রতীক্ষিত ভাষণ শোনে, এই ভাষণে তিনি দক্ষিণ মৈশুন্দির কথাও উল্লেখ করেন; আলমগীর হোসেন যার মাধ্যমে উপপ্রধানমন্ত্রীর ভাষণে দক্ষিণ মৈশুন্দির নাম ঢোকায় তার সেই বন্ধু, উপপ্রধানমন্ত্রীর গণসংযোগ কর্মকর্তার কাছ থেকে সে ভাষণের একটি কপি সংগ্রহ করে এবং এই ভাষণের একটি বাক্যের ভেতর আমাদের মহল্লা, দক্ষিণ মৈশুন্দির নাম আমরা এভাবে দেখতে পাই, 'দোলাইখাল, দক্ষিণ মৈশুন্দি, ইত্যাদি এলাকার লোক ছোট লেদ কারখানায় নীরবে যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তার মূল্যায়ন এবং প্রশংসা আমাদের করতেই হবে', অচিরেই আমরা মহল্লার সব লেদ কারখানায় এই ভাষণটির ফটোকপি টাঙানো দেখতে পাই এবং আমাদের সুবিধার জন্য 'দক্ষিণ মৈশুন্দি নামটার নিচে লাল রঙের মার্কার দিয়ে দাগ দিয়ে দিই, আমাদের আনন্দ এবং গর্ব হয়, কিন্তু এর ভেতর আমাদের একটি বঞ্চনার কথা মনে পড়ে, আমাদের এই সাফল্য দেখানোর জন্য মহল্লায় আমরা তখন আব্দুল গফুরকে পাই না, আমাদের মনে পড়ে সে মহল্লায় আসার পর আমাদেরকে 'তরমুজখোর' বলে গাল দেয়, কিন্তু পরিণতিতে আমরা টিকে যাই, কারণ তরমুজ মাথা ও নাভি ঠাণ্ডা রাখে, আর সে তার বাড়িতে এক নিঃসঙ্গ বায়ুচড়া দুপুরে কড়িবর্গার সঙ্গে ঝুলে থাকে; আমরা এই খবর পাওয়ার পর বিস্মিত হই না, কারণ, তরমুজ সম্পর্কে আমাদের জানা ছিল, আমরা তখন রাস্তায় যাই এবং দেখি যে, সংকীর্ণ রাস্তার ওপর তরমুজওয়ালাদের দোকানের কারণে পুলিশের গাড়ি আটকে যায়, আমরা তখন এতদিন পর বুঝতে পারি তরমুজওয়ালারা কেন চিপা জায়গায় দোকান নিয়ে বসে; পুলিশ সহজে মহল্লায় ঢুকতে পারে না, তারা ঢুকতে পারার আগেই আমরা পুলিশ আসার খবরটা পেয়ে যাই, ফলে আমরা প্রস্তুত হতে পারি, আমরা আটকে যাওয়া পুলিশকে একটি প্রশ্ন করি, প্রশ্নটি হঠাৎ করেই আমাদের মাথায় আসে, কারণ তরমুজওয়ালা তখন একটি তরমুজ কেটে তার টকটকে গর্ভ উন্মোচিত করলে এই রঙের ঔজ্জ্বল্য আমাদের হঠাৎ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, আমরা পুলিশকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ভাই, তরমুজে কি ভেজাল হয়া

পারে? আটকে যাওয়া গাড়ির ভেতর বসে থাকা সূত্রাপুর থানার পুলিশ আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কটমট করে তাকায়, তখন আমরা বড় চালকুমড়োর মত একটি করে তরমুজ নিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরি, এবং মহল্লায় তখন আমরা আমাদের নারীদের ব্যতিক্রমী মেধা এবং রুচির প্রকাশ অবলোকন করি; আমরা যখন তরমুজ কিনে আনি তরমুজওয়ালা চাকু দিয়ে চৌকো কোণাতোলা একটি টুকরো কেটে বের করে এর লাল রঙ দেখায়, আমরা সেটা পরখ করার পর সে বলে, এক্কলে মাখখন, এবং টুকরোটা পুনরায় যথাস্থানে প্রবেশ করিয়ে দেয়, আমরা যখন এই তরমুজ বাসায় নিয়ে আসি, আমাদের স্ত্রীরা কাটা টুকরোটা প্রথমে পুনরায় টেনে বার করে এবং আমরা শুনতে পাই যে, তারা বলে, এমুন লাল, মনে লয় য্যান বুকের ভিতর থেইকা কইলজা টাইনা বাইর করলাম, তাদের কথা শুনে আমরা প্রথমে চমৎকৃত হই, তারপর আমাদের একাধিক প্রতিক্রিয়া হয়, আমাদের মনে হয় যে, এই কথাটি আমাদের কেন আগে মনে হয়নি, তারা এই ধারণাটা কোথায় পেল? আজিজুল হকের কবিতায় কি তরমুজের এ রকম উপমা দেয়া হয়ে থাকতে পারে? এবং আমাদের স্ত্রীরা কি তার লেখা কবিতা পড়ে? আমাদের মনে হয় যে, হয়তোবা পড়ে, কিন্তু আমাদের একই সঙ্গে মনে হয় যে, আজিজুল হকের কবিতা পড়ে কি আমাদের স্ত্রীরা বুঝতে পারে? আমরা জানি না, কিন্তু আমরা বিমর্ষ বোধ করি, কারণ, আমরা যখন ঝর্ণা বসাকের কথা জানতে পারি আমাদের তখন ননি বসাক স্যারের ওপর রাগ হয়, আমরা তার হাতে কানমলা এবং বেত খেয়ে গ্রাজুয়েট হাই স্কুলের জীবন শেষ করে লেদ মেশিন অথবা কাচের কারখানায়, পুরানো যন্ত্রাংশ অথবা ইলেক্ট্রিকের সরঞ্জামের দোকানে জীবিকার জন্য ঢুকে পড়ি অথচ আমরা জানতে পারি না যে, ননি বসাকের একটি মেয়ে আছে, এবং আমাদের জীবন এক ধরনের অপচয় বোধে আক্রান্ত হয় যখন ঝর্ণা বসাক ফিল্মের নায়িকা হয় এবং আমরা তাকে আবিষ্কার করি; আমরা রূপমহল সিনেমা হলে গিয়ে চান্দা অথবা তালাশ, অথবা উভয় ছবিতেই তাকে দেখি; তাকে দেখে আমাদের বিষণ্নতা বেড়ে যায়, কারণ, আমরা বুঝতে পারি যে, কি অসাধারণ সুন্দরী সে, কিন্তু সে আমাদের নয়, আমাদের মনে হয় যে, ফিল্মের নায়িকা হয়ে যাওয়ায় আমরা তাকে হারাই; সে আমাদের এত কাছে ছিল, জোড়পুল, বনগ্রাম, পদ্মনিধি লেন, অথবা অন্য কোথাও, কোনো চুন-সুরকির নোনা ধরা দালানের ভেতর, কিন্তু আমরা জানতে পারি নাই; আমরা ঠিক করি যে, আমরা ননি বসাক স্যারকে ডেকে একদিন জিজ্ঞেস করব, ঝর্ণা বসাক সত্যি তার মেয়ে কিনা; কিন্তু আমাদের আর সময় হয় না, আমরা স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিই

এবং ঝর্ণা বসাকের শোক ক্রমান্বয়ে নেমে যায়, তবে তার কথা আমরা ভুলে যাই না; তখন আজিজুল হকের কবিতা লেখার কথা আমরা যখন শুনি, আমাদের মনে হয় যে, সে কী নিয়ে কবিতা লেখে? কারণ, তার লেখা কোনো কবিতার চেহারা আমরা দেখতে পাই না, আমাদের সন্দেহ থাকে না যে, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে অথবা ভোর হলো দোর খোল ধরনের কোনো কবিতা আমরা হয়তো দেখতে পাব, অথবা হয়তোবা কোনো প্রেমের কবিতা, ঝর্ণা বসাককে নিয়ে, কারণ, ননি বসাকের অত্যাচার সহ্য করার পর ঝর্ণা বসাকের বিষয়ে শোকগ্রস্ত না হয়ে আজিজুল হকের কি কোনো উপায় ছিল? আমাদের মনে হয় না, কিন্তু আজিজুল হক পাগল হয়ে যাওয়ার পর তাকে যখন পাবনায় পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়া হয়, তার আগ পর্যন্ত আমাদের হাতে তার একটি মাত্র কবিতা আসে এবং আমরা া পড়ে কিছুই বুঝতে পারি না, আমরা বরং তরমুজ সম্পর্কে জানতে পারি, পুলিশকে আমরা জিজ্ঞেস করি, তরমুজ খাইবেন? তারা আমাদেরকে ধমক দেয়, ধুত, আমরা হাসি, কারণ, পুলিশ দেখলে আমাদের সবসময় হাসি পায়; আমরা বুঝতে পারি যে, তরমুজ হচ্ছে ডিমের মতো, পচে যেতে পারে, ভেজাল হতে পারে না; কিন্তু এই বিষয়টি কালক্রমে আমাদেরকে অন্য এক ধরনের বিভ্রান্তির ভেতর ঠেলে দেয়, আমরা মহল্লায় দিনে দেড়মণ নাটবল্টু, দশমণ পাউরুটি/বিস্কুট/লেবেঞ্চুশ, সাতগ্রোস কাচের গ্লাস বানানোর পর বিকালে অথবা সন্ধ্যায় জানতে পারি যে, তরমুজে ভেজাল হতে পারে, সাদা তরমুজের ভেতর লাল রঙ এবং চিনির পানি ইঞ্জেকশন করে ঢোকান হয়, ফলে তরমুজ হয় লাল এবং মিষ্টি, এই কথা শুনে আমরা বিস্মিত এবং একই সঙ্গে ক্ষুব্ধ হই, আমাদের মনে হয় যে, মানুষের জীবনে কি কোনো মূল্যবোধই অবশিষ্ট থাকবে না! তখন আমরা একটি বাঁশির সুর মহল্লার ভেতর দিয়ে বয়ে যেতে শুনি, আমাদের স্ত্রীরা দরজার কপাট ধরে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়, আমরা দেখি এবং আমাদের মনে পড়ে যে, পরম নিষ্পাপ তরমুজেও ভেজাল হয়, আমরা তখন তরমুজ কেটে ফালা ফালা করি, কিন্তু এর লাল রঙের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি না, এই রঙ আসল, না নকল; তরমুজের কারণে, বেশি জ্ঞানের অসুবিধার দিকটি আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়, জ্ঞান আমাদের মনের এতদিনকার শান্তি নষ্ট করে দেয়, আমরা বলি, হালার মায়ামানুষতো মায়ামানুষ, তরমুজেই ভেজাল হয়; কিন্তু তখন এক সময় আমরা শেফালিকে দেখি, হাফ প্যান্টের অংশ গুটিয়ে আমরা দেয়ালের পাশে লাইন করে দাঁড়িয়ে পেশাব করি, তারপর যখন ঘুরে দাঁড়াই, দেখি যে, শেফালি স্কুল থেকে ফিরে আসে; আমরা, বালকেরা, তার হাতে একটি গাছের চারা দেখতে

পাই এবং তৎক্ষণাৎ তা চিনতে পারি, কীভাবে পারি তা বুঝতে পারি না, কিন্তু পারি, এবং আমরা চিৎকার করে উঠি, এই শেপালি ফুলগাছ; আমরা দেখি যে, শেফালি যেতে যেতে তার ক্লান্ত মুখটি ঘুরিয়ে তাকায়, তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারি না শেফালিফুল গাছ আমরা কাকে বলি, গাছের চারাটিকে, নাকি শেফালিকে, তখন, তারপর আমাদের মনে হয় যে, শেফালিকে নিয়ে আমাদের পূর্বেকার বিভ্রান্তির সমাধান এটাই, শেফালি ফুলও নয়, গাছও নয়; শেফালি, শেফালি ফুলগাছ; এ ব্যাপারে আমরা যখন নিশ্চিত হই তখন পঁচিশ নম্বর বাড়ির মামুনের কথা আমরা শুনতে পাই, সে খুব ভাল একটি কাজ করে, আমরা জানতে পারি যে, সে তরমুজওয়ালার কাছে গিয়ে বলে, মিয়া ভেজাল দেওয়া তরমুজ লয়া আহো ক্যালা, কিন্তু তরমুজওয়ালা তার কথা বুঝতে পারে না, আমরা যখন শুনি আমাদের প্রথমে মনে হয় যে, তরমুজওয়ালা আসলেই কথা বুঝতে পারে নাই, তরমুজওয়ালারা বোকা হয়, কারণ, তা না হলে তারা তরমুজ বিক্রি করত না, আমাদের মতো কিনে খেত; কিন্তু পরে আমাদের মনে হয় যে, তরমুজওয়ালাই আসলে চালাক, সে তরমুজ না খেয়ে পয়সা জমায়, এবং মামুনের কথা শুনে ইচ্ছে করে না বোঝার ভান করে, কি কন আপনে? কিন্তু মামুন যখন ব্যাপারটা পুনরায় বুঝিয়ে বলে সে হাসে এবং আমরা তার বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হই, সে তরমুজের একটা ছোট টুকরা কেটে নিয়ে মামুনের গায়ের সাদা শার্টের নিচের প্রান্তে ঘষে দিলে কাপড়টা লাল হয়ে যায় এবং মামুন বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে, এই রং আইলো কইত্থন, মিয়া, আবার কও রং দেও না! কিন্তু ঘটনার তখনো বাকি ছিল, তরমুজওয়ালা তখন কাছের দেয়ালের গা থেকে এক চিমটি শেওলা তুলে নিয়ে মামুনের শার্টে ঘষে দেয় এবং সাদা শার্টে লাল দাগের পাশে সবুজ রঙের একটি দাগ হয়ে যায়, এবং সে বলে, এ্যালা? তখন মামুনের কিছু বলার থাকে না; আমরা যখন এই গল্প শুনতে পাই, নিজেরা পরীক্ষা করে দেখি, এবং তখন আমাদেরও কিছু বলার থাকে না, ফলে আমাদের স্ত্রীরা তরমুজ ছোট চৌকো করে কেটে বাটি ভরে নিয়ে আসে, আমরা টুকরো তুলে মুখে দিই, আমাদের মুখের গর্তের ভেতর অল্প চাপে হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো গলে যেতে থাকে তরমুজ এবং হাতের ভেতর নারী; এক হাতে তরমুজের বাটি, অন্য হাতে যুবতী স্ত্রীর একটি স্তন ধারণ করে আমরা পৃথিবীতে গোলাকার বস্তুর মর্ম বুঝতে পারি; তখন স্কুল পালিয়ে আমরা একদিন বলাকা সিনেমা হলে একটি ইংরেজি ছবি দেখতে যাই, এন্ড হোয়েন শি ওয়াজ গুড, আমাদের সঙ্গে, আমাদের মনে পড়ে, আজিজুল হকও ছিল; আমরা এই ছবির ইংরেজি কথাবার্তা বুঝতে পারি না,

কিন্তু ছবির একটি দৃশ্যে তরমুজ দেখতে পেয়ে আজিজুল হক ছাড়া আমাদের সকলের আনন্দ হয়, ছবির নায়িকা নাপিতের চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তরমুজের গায়ে সাবানের ফেনা লাগিয়ে শেভ করার মহড়া দিচ্ছিল; আমাদের পিতারা চুমুর দৃশ্যওয়ালা ছবি দেখার জন্য আমাদের গাল দিলেও আমরা দেখতে পাই যে, জীবনে কত কিছু শেখার আছে; আজিজুল হক ছাড়া আমরা অন্য সকলে তখন স্কুল ছেড়ে দিই এবং আমাদের দাড়ি মোচ গজাতে থাকে, তখন শেভ করতে গিয়ে গাল এবং গালের নিচে ক্রমাগতভাবে কেটে যেতে থাকলে ইংরেজি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগে, আমরা দাড়ি শেভ করার বিষয়টি অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং আমরা তখন তরমুজ কিনে নিয়ে আসি, এক তরমুজে তখন দুই কাজ হয়, দাড়ি শেভের অনুশীলন এবং খাওয়া, আমরা তরমুজের গায়ে সাবান লাগিয়ে রেজর দিয়ে এই ফেনা পরিষ্কার করে তুলে আনি তরমুজের গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে, এবং দাড়ি কাটার ব্যাপারে আমরা দক্ষ হয়ে উঠি, মহল্লার ভেতর কেবলমাত্র আজিজুল হক দাড়ি কাটে না এবং তার চুল লম্বা হয়ে কাঁধ ছোয়, কারণ, তার রক্তের ভেতর তরমুজের প্রতি গভীর এবং প্রবল এক অনীহা ছিল; তার পিতা, আব্দুল গফুর, যখন মহল্লার লোকদের 'তরমুজখোর' বলে, আমরা শুনতে পাই যে, মহল্লার লোকেরা তাদেরকে বলে, 'পাগলের গুষ্টি', সলিমুল্লাহ কলেজে পড়ার সময় আজিজুল হকের চুল পাক দিয়ে নেমে আসে, তখন আমাদের কাজী নজরুল ইসলাম অথবা রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে, আমরা বলি, কবিকবি ভাব, এবং আমরা দেখি যে, আমাদের অনুমান সত্য হয়ে ওঠে, কারণ, আমরা জানতে পারি যে, আজিজুল হক কবিতা লেখে; কিন্তু তার কবিতা আমরা বুঝতে পারি না, আমরা কোনো একদিন কোনো এক কাগজে তার লেখা একটি কবিতা দেখতে পাই, তখন সেটা আমরা পড়ে দেখার চেষ্টা করি, কবিতাটা ছিল এরকম: তিনটি বিন্দু ছিল সামনে/ ডানে বাঁয়ে এবং/মাঝখানে/অথবা/ একটি রেখা ছিল/ডান থেকে বাঁয়ে কিংবা/বাম থেকে ডানে/অথবা একটি বাক্য ছিল রেখার মতো/কারণ, তখন অর্থ ছিল না/কারণ, তখন বাক্য রেখা ছিল/ এবং রেখা বিন্দু ছিল, অথবা/তখন অর্থ ছিল/রেখা তখন বাক্য ছিল/এবং বাক্য জীবন ছিল/কারণ, তখন স্বপ্ন ছিল/বাক্য তখন কথা ছিল;/কিন্তু তখন স্বপ্ন ছিল না/আমরা জাগরণের পীড়নের ভেতর নিদ্রিত ছিলাম/আমাদের নিদ্রার ভেতর ভালবাসার অঙ্কুর ছিল না/কারণ, তখন বাক্য রেখা ছিল/রেখা তিনটি বিন্দু ছিল/মাটিতে/পানিতে/ এবং আকাশে/ কারণ, তখন অর্থ ছিল না/এবং তোমার কথা/অন্য কথা ছিল; আজিজুল হকের কবিতার কোনো অর্থ

যখন আমরা বুঝতে পারি না, আমরা তরমুজ কিনে এনে কেটে খাই এবং বলি, পাগল, তারপর একদিন, সে লুঙ্গি ছাড়া মহল্লার রাস্তায় নেমে পড়লে আমরা তাকে পাগলাগারদে নিয়ে গিয়ে রেখে আসি; তখন মহল্লার বাতস সুগন্ধে ভরে যায়, স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আমরা বই রেখে কফিলুদ্দিন ব্যাপারির নূতন বিস্কুটের কারখানার দিকে দৌড় দিই, আমরা গিয়ে দেখি কারিগরেরা লম্বা লম্বা উঁচু টেবিলের ওপর ময়দা ছেনে টিনের ট্রে-র ওপর বিস্কুট বানিয়ে রাখে এবং নিচে মেঝেতে পাতা চাদরের ওপর মহল্লার লোকেরা বসে অপেক্ষা করে, তারপর মৌলবি আসেন এবং আমরা 'ইয়ানবি সালামালাইকা' বলে মিলাদ পড়ি, মিলাদ পড়া শেষ হলে কুঁড়েঘরের মতো চুল্লির চারকোনা দরজা খুলে ফেলা হয় এবং নৌকার বৈঠার মতো লম্বা কাঠের হাতা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কারিগরেরা এই কারখানার প্রথম তৈরি বিস্কুটের ট্রে বের করে আনে এবং কফিলুদ্দিন ও তার ছেলেরা ছোট ছোট ঠোঙ্গায় এই বিস্কুট ভরে আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়; এভাবে মিলাদ পড়ানোর পর হাজি আব্দুর রশিদের লজেঞ্জ কারখানায় উৎপাদিত প্রথম লজেঞ্জের ভাগ আমরা পাই, কিন্তু লেদ মেশিন বসানোর পর ৪৪০ ভোল্টের ১/২ ঘোড়া শক্তির মটর বসানো হয় এবং আমরা ভিড় করে আব্দুল জলিলের কারখানা দেখতে যাই, পুনরায় মিলাদ পড়ার পর আমরা জিলাপি খাই এবং মহল্লায় শব্দ এবং মিষ্টি গন্ধের ভেতর আমাদের ল্যাংড়া পুতুলের কথা মনে পড়ে, আমরা কফিলুদ্দিন ব্যাপারির ছেলেকে বলি, পুতুল আয়া পারেনিকা, অর লাইগা বিস্কুট দেন; কিন্তু পুতুল বেগমের বিস্কুটের ঠোঙা আমরা তার কাছে পৌঁছে দিতে পারি না, বিভিন্ন ঝামেলায় পড়ে আমরা নিজেরাই তা খেয়ে ফেলি, আমরা তখন ফুলের গন্ধ পাই এবং আমাদের স্ত্রীরা বলে, শেফালি ফুলের ঘেরাণ আহে, বিস্কুট এবং লজেঞ্জ ফ্যাক্টরির ছড়িয়ে দেয়া মিষ্টি গন্ধ ছাপিয়ে এই গন্ধ ভেসে আসে এবং আমাদের স্ত্রীরা তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, শেফালি ফুল, নাকি হাস্নাহেনা? মহল্লায় বহুদিন আমরা ফুল দেখি নাই, কিন্তু হাস্নাহেনার কথা শুনে আমাদের মনে পড়ে যে, শীতের দিনে হাস্নাহেনাব তীব্র গন্ধে সাপ আসে, বহুদিন আমরা মহল্লায় সাপ দেখি নাই; আমরা তখন আসলাম ব্যাপারির খোঁড়া বড় মেয়ে পুতুল বেগমের জন্য জিলাপি চেয়ে নিই এবং মন্দিরের রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসে নিজেরাই তা খাই, তখন আমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে আমরা ঘটনাটা জানতে পারি এবং মহল্লার রাস্তায় পুতুলের প্রতীক্ষা করি, কিন্তু সে আসে না, ফলে আমরা আব্দুল গফুরের বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে লাগানো আসলাম ব্যাপারির বাড়িতে যাই এবং দেখতে পাই পুতুল দুপুর বেলা তাদের বাইরের বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ওপর

দিয়ে আব্দুল গফুরের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে; সে আমাদের দিকে ফিরে তাকায়, তার ফরসা সুন্দর মুখ এবং ওপরের ঠোঁটে ফুটে থাকা কালো তিলের সুষমা আমাদেরকে বিচলিত করে, কিন্তু তখন কোমরের নিচে আমরা যখন তাকাই, সালোয়ারের ভেতর তার অকেজো পা ঝুলে থাকতে দেখি; আমরা এই বিষয়টি বুঝতে পারি যে, দেয়ালের অন্য পার থেকে আমিনুল হক মেয়েটির শুধু মুখ দেখতে পায়, লাঠিতে ভর দেয়া নিচের অংশ দেখে না, এবং এভাবেই ঘটনাটা ঘটে; তরমুজ নিয়ে কত রকমের জটিলতা আমাদের আক্রান্ত করে, মহল্লায় নারী এবং পুরুষ, আমরা দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ি এবং আমাদের জীবনের একমাত্র আনন্দ তরমুজ খাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, কারণ, আমাদের স্ত্রীরা তরমুজ স্পর্শ করতে অস্বীকার করে, আমরা পুনরায় বুঝতে পারি যে, নিষ্পাপ বলে কিছুই নেই, এবং আমরা জানতে পারি, আমাদের স্ত্রীরা আলমগীর হোসেনের স্ত্রীর কাছ থেকে এই গল্প জানতে পারে; আলমগীর হোসেন তাদের সমিতির সভায় অথবা সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য বগুড়া যায়, তখন যাওয়ার পথে কোনো এক জায়গায়, বেড়া, উল্লাপাড়া অথবা শেরপুরের কাছে, বিস্তৃত মাঠে মাটিতে বিছানো খড়ের ওপর লতাগুল্মের মতো তরমুজ গাছ দেখে সে চিনতে পারে, কারণ, বড় বড় ডিমের মতো সাদা তরমুজ মাঠ জুড়ে পড়ে ছিল, তখন সে সেই দৃশ্যটি দেখতে পায়, একটি লোক, সম্ভবত কৃষক, রাস্তার দিকে পিছন ফিরে বসে পাছার কাপড় উদোম করে তরমুজ ক্ষেতের ভেতর মলত্যাগ করে; এই খবরে আমাদের মন খারাপ হয়, আমরা বিষণ্ন হয়ে পড়ি, কিন্তু তরমুজের নেশা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, আমরা তরমুজ কিনে নিয়ে ঘরে ফিরি এবং এই ফল দেখে আমাদের স্ত্রীরা বমি করে ফেলে, ফলে তখন মন্দিরের রোয়াকে বসে থেকে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠি, আমাদের বারবার পেশাব চাপে, দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে হাফপ্যান্টের ফাঁক দিয়ে তিনবার পেশাব করার পর আমাদের চুপ করে বসে থাকতে হয়, কারণ, বৃষ্টির জন্য রাস্তা কাদা হয়ে যাওয়ায় আমরা খেলতে পারি না, তখন হাজি আব্দুর রশিদের লেদ কারখানার নির্মাণের জন্য ইট বয়ে আনতে গিয়ে একটি সবুজ রঙের ট্রাকের পিছনের চাকা আলি আকবরের বাসার সামনে কাঁচা মাটিতে বসে যায় এবং আমরা তৎক্ষণাৎ মন্দিরের বারান্দা ত্যাগ করে গিয়ে তরমুজের মাছির মতো ট্রাকটিকে ঘিরে ধরি; কিন্তু কৃষকদের কথা আমরা ভুলতে পারি না, আমরা আবার তরমুজওয়ালার কাছে যাই, গিয়ে বলি, গ্রামের মানুষ এমুন খবিশ ক্যালা, হালারা হোগা বাইর কইরা রাখে, তারপর বাটি থেকে চারকোনা করে কাটা তরমুজ নিয়ে মুখে দিই, কিন্তু আমাদের স্ত্রীরা

খায় না এবং আমরা দেখি যে, একা একা খেতে আমাদের ভাল লাগে না, তখন আমরা একটি অনুভব অথবা উপলব্ধিকে আবিষ্কার করি, একা তরমুজ খেতে গিয়ে আমরা আমাদের জীবনে স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝতে পারি; তখন তরমুজওয়ালা আমাদেরকে এই সঙ্কট থেকে রক্ষা করে, সে বলে, সাবান দিয়া ধুইয়্যা খান, এবং আমরা বাংলা সাবানের একটা করে ফালি কিনে নিয়ে আসি, এবং তখন, আমরা যখন বাঁশির সুর শুনতে পাই আমরা পুতুলের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবি; আমাদের মনে পড়ে যে, আব্দুল গফুর মাষ্টারের ছোট ছেলে যখন গ্রাম থেকে প্রথম আসে সে তখনই একটি বাঁশি সঙ্গে করে আনে, এই বাঁশিটি ছিল অন্য রকম, এ ধরনের বাঁশি আমরা এর আগে মহল্লায় কাউকে বাজাতে দেখিনি, আমিনুল হক মহল্লায় আসার আগে আমরা বাঁশির পাছায় ফুঁ দিয়ে বাজাতাম, কিন্তু তার বাঁশিটি দেখে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি, এটা ছিল আগাগোড়া একটা খোলা নলের মতো, পাছায় ফুঁ দেয়ার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, এই বাঁশি বাজানোর ফুটো ছিল এক প্রান্তে নলের গায়ের ওপর; আমরা চেষ্টা করে যখন এই বাঁশি বাজাতে ব্যর্থ হই, তখন সম্ভবত তা ল্যাংড়া পুতুল শুনতে পায় এবং এতে করে হয়তো তার ঔৎসুক্য বাড়ে, কারণ, আমাদের মনে হয় যে, ল্যাংড়ারা এরকমই হয়, তারা নিজেরা চলতে পারে না বলে তাদের মন অলিগলি হাঁটে; তখন আমরা আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়টি বুঝতে পারি, কারণ, পুতুলের মত টাইফয়েড জ্বরে আমাদেরও পা শুকিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তা যায়নি, তখন এই আনন্দের কথা শুনে আমাদের স্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে পুনরায় তরমুজ খেতে রাজি হয়, আমরা চাকর পাঠিয়ে বরফের কুচি কিনে আনি, বাটিতে টুকরো করা তরমুজের সঙ্গে বরফ মেশানোর পর আমরা যখন তা মুখে পুরে আমাদের স্ত্রীদের দিকে তাকাই তারা টু-ইন-ওয়ানের রেডিওর বোতাম টিপে দিয়ে বলে, আচকা রেডিওতে আমিন ভাইয়ের প্রগ্রাম আছে, আমরা তখন একটি প্রলম্বিত বোঁ.. ধ্বনি শুনি, এতে আমাদের বড় অস্থিরতা হয়, আমরা পুনরায় মহল্লার তরমুজওয়ালার কাছে যাই এবং জানতে চাই, তরমুজ আসলে গাছের ডিম কিনা, কিন্তু সে বলে যে, তরমুজে তা দিলে তরমুজ জন্মে না, ঘোড়ার বাচ্চা জন্মে, তাই কেউ তরমুজে তা দেয় না, কারণ, ঘোড়ার বাচ্চার জন্যতো ঘোড়ার মা-ই আছে; ঘোড়ার ডিমের কথায় আমরা বুঝতে পারি যে, আমিনুল হক কোনো একদিন বাঁশি বাজানো থামিয়ে যখন তাদের বাড়ির প্রাচীরের ওপর দিয়ে তাকায় তখন সে সেই প্রাচীরের ওপর ডিমের মতো একটি মুখ দেখতে পায়, আমরা এইসব বিস্তারিত জানতে পারি, অথবা বিস্তারিত জানতে পারি না, কিছু কিছু জানতে পারি, পুতুলের মুখটির দিকে

তাকিয়ে আমিনুল হক ক্রমাগতভাবে দেয়ালের কাছে সরে আসে এবং একদিন ওপর দিয়ে তাকায়, তখন, সেদিন, সে এই খণ্ডিত নারীকে আবিষ্কার করে, কিন্তু তখন তার আর ফিরে যাওয়ার পথ থাকে না, কারণ, মহল্লায় লোক বেড়ে যায়, লেদ মেশিনের কাজ শুরু হয় এবং বাবুল মিয়া ও তার সঙ্গীরা মহল্লার রাস্তায় চোরপুলিশ খেলতে গিয়ে চিৎকার করে মাথা ধরিয়ে দেয়, আমরা মাথা ব্যথার জন্য কডোপাইরিন কিনে খাই, কিন্তু ব্যথা যায় না, তখন পটুয়াটুলির কাপড়ের ব্যাপারি ইয়াকুব আলি মহল্লায় চার নম্বর লেদ মেশিন বসায়, কাঠের বড় বাক্সের ভেতর রাখা মেশিনটি একটি ট্রাকে করে এনে নামানো হয়, কিন্তু ব্যাপারি সাহেবের চৌষট্টি নম্বর বাড়ির দরজা দিয়ে সেটা ভেতরে প্রবেশ করানো কষ্টকর হয়ে পড়ে, আমরা তখন খবরটা পাই এবং কপালের দুইপাশে স্যালোনপাসের পট্টি লাগিয়ে ইয়াকুব ব্যাপারির বাড়িতে গিয়ে মেশিনটা দেখি এবং ভাড়া করে আনা শ্রমিকদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে ঠেলা দিই; আমাদের মহল্লার চারটি লেদ মেশিন যখন চলতে থাকে আমরা তার শব্দ পাই এবং আমাদের হাজি মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ ব্যাপারির কথা মনে পড়ে, আমাদের এটা ভেবে দুঃখ হয় যে, তার নামটি এবং তার তরমুজের বিচি খাওয়ার ঘটনার কথা উপপ্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আমরা ঢোকাতে পারি না, আমরা যখন বলি যে, এই ভাষণের একটি করে কপি আমাদেরকেও দেয়া হোক, আলমগীর হোসেন নিজের পয়সায় ফটোকপি করে তা আমাদেরকে দেয়, আমরা সেটা বারবার পড়ে ঘুমুতে যাই; ঘুমের ভেতরে আমরা আমাদের মাথা ব্যথা টের পাই, স্যালোনপাসের মেন্থলের ঘ্রাণ আমাদের নাকে আসে, আমরা তখন তাকে দেখতে পাই, সে ঘাড়ের ওপর দিয়ে তার ক্লান্ত মুখ ঘুরিয়ে তাকায়, আমরা তখন তরমুজের মূল কথাটি জানতে পারি এবং দেখি যে, তরমুজের সঙ্গে আমরা কত গভীরভাবে জড়িত, পুতুলের সব বিস্কুট এবং জিলাপি মন্দিরের বারান্দায় বসে খাওয়ার পর, দেয়ালের ওপর দিয়ে আমিনুল হকের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা আমরা জানতে পারি এবং তাদের বাসায় গিয়ে বলি, প্রেম করচ! আমরা জানতে পারি যে, আমিনুল হকের প্রেমে পড়েছিল আসলে দুজন এবং তখন আমরা একটি চক্র আবিষ্কার করি; তরমুজের সরবরাহ কমে এবং দাম বেড়ে যেতে থাকে, অবশেষে একদিন আমরা এই খবরটি পাই যে, তরমুজওয়ালা মাত্র তিনটি তরমুজ নিয়ে মহল্লায় হাজির হয়েছে, এই কথা শুনে আমাদের রাগ হয়, আমরা তার কাছে যাই এবং কাঁধে ধাক্কা দিই, মাথায় গাট্টা মেরে বলি, আমাগো লগে ফাইজলামি করচ! কিন্তু তরমুজের সরবরাহ বাড়ে না, তরমুজওয়ালা তিনটি তরমুজ ফালি করে কেটে গামছার ওপর ভাগা দিয়ে রাখে, আমরা এক

ফালি করে কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাই, আমাদের দুর্ভিক্ষের কথা মনে হয়, আমাদের জীবন ম্রিয়মাণ হয়ে আসে, আমাদের এক হাতের ভেতর কেবল স্ত্রীর বক্ষ থাকে, আর একহাত খালি, আমরা স্ত্রী সংসর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি; আমরা তখন তরমুজওয়ালাকে পুনরায় ধরি এবং সে আমাদেরকে বলে যে, ট্রাক ধর্মঘটের কারণে রাজশাহী, বগুড়া এবং চট্টগ্রাম থেকে তরমুজ আসে নাই, ফলে, তখন আমাদের জানার দরকার হয় ট্রাক ধর্মঘট কেন হচ্ছে, আমরা জোড়পুলে ওয়াজেদ ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে সেদিনের ইত্তেফাকটা পাই এবং জানতে পারি যে, ট্রাক ধর্মঘট হচ্ছে কারণ ট্রাকের টায়ার টিউব এবং খুচরা যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে গেছে; আমাদের তখন মনে হয় যে, এই সঙ্কটের দ্রুত একটা সমাধান হওয়া দরকার, মহল্লায় যারা যন্ত্রাংশের দোকানদারি করে আমরা তাদের কাছে যাই এবং যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধির দুটো কারণ জানতে পারি, এক, যারা স্থানীয়ভাবে এই যন্ত্রাংশ তৈরি করে তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম তিনগুণ বাড়িয়েছে, এবং দুই, মটর গাড়ির যন্ত্রাংশের আমদানির ওপর যে শুল্ক ধার্য ছিল, তা বিশ শতাংশ বাড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ শতাংশ করা হয়েছে; আমরা তখন মহল্লায় গ্রাইন্ডার/ব্লেন্ডার ইত্যাদি আধুনিক গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শুরু করি এবং আমাদের স্ত্রীরা এই মেশিনের ভেতর ফেলে তরমুজের শরবত বানাতে শেখে, এবং তা খেয়ে আমাদের মনে হয় যে, তরমুজের গুণের কোনো শেষ নাই, আমরা তাই আলমগীর হোসেনকে খুঁজে বের করে বলি, কিছু করেন আমাগো লাইগা, তরমুজের দাম বাইড়া গেল, দশ ট্যাকার তরমুজ অখনে তিরিশ ট্যাকা দাম, আমরা বাঁচি কেমনে; তখন সে আমাদেরকে বলে যে, লেদ মেশিনের কাঁচামালের দাম বেড়ে গেছে, কর বসানো হয়েছে, তাছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের, যেমন চাল, ডাল, তরমুজের দাম বেড়েছে, কাজেই তারা কী করতে পারে; তার কথা শুনে আমরা বুঝতে পারি কেমন করে তরমুজের দাম বাড়ে বলেই তরমুজের দাম বাড়ে, তরমুজ কেমন করে নিজের দাম নিজে বাড়িয়ে নেয় একটি চক্রের ভেতর দিয়ে, এবং এই চক্রের ভেতর আমরা দক্ষিণ মৈশুন্দির অবস্থান আবিষ্কার করি, আমরা তরমুজের দাম কমানোর কোনো পথ খুঁজে পাই না, ত্রিশ টাকা থেকে নেমে তা পঁচিশ টাকায় স্থায়ী হয়, ফলে আমাদের তৈরি বিস্কুট, লজেঞ্জ, নাটবল্টুর দাম বাড়ে; তরমুজের মতো চমৎকার একটি জিনিস আমাদের জীবনকে কেমন জটিল করে তোলে, তবে তরমুজ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রসারিত হয়, কারণ, আমাদের মহল্লায় হাস্নাহেনার ঘন মিষ্টি গন্ধ এবং বাঁশির ভারি সুর বাতাসে ভেসে আসে, এবং আমরা পরে যখন ভেবে দেখি,

আমরা বুঝতে পারি, তরমুজ খাওয়া কতটা উপকারী এবং লাভজনক, এটা কেব· দেহ মন ঠাণ্ডা রাখে, তা নয়, এটা জীবনে একটি উদ্দেশ্য এনে দেয়, না হলে শূন্যতার ভেতর মানুষ পথ হারায়; তখন আমরা পূর্ণাঙ্গ মন ও খণ্ডিত দেহের ভেতর আটকা পড়ে যাওয়া পুতুল বেগমের মুখের দিকে তাকাই, আমাদের কথা শুনে তার মুখ বিষণ্ন হয়ে ওঠে, এই মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের খারাপ লাগে, আমরা তাই কাদায় আটকে পড়া ট্রাকের কাছে মজা দেখার জন্য বসে থাকি এবং জানতে পারি, একটি ট্রাককে কাদা থেকে টেনে তুলতে কত কাজ করতে হয়, তখন আমাদের খাটো হাফপ্যান্টের ফাঁক দিয়ে কিছু দেখা যায় বুঝতে পেরে আমরা উঠে দাঁড়াই, তখন ট্রাকের হেল্পার পিছনের এক্সেলে জ্যাক লাগিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাকাটা উঁচু করে, তারপর চাকার নিচে ভাল করে ভাঙা ইটের কুচি গুঁজে দেয়ার পর ড্রাইভার ইঞ্জিন চালু করে টান দিলে গাড়ি ঝাঁকি দিয়ে গর্ত পার হয়ে বের হয়ে যায়; আমরা তখন হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরি, আমাদের হাতে লেদ মেশিনের মবিলের গন্ধে আমাদের স্ত্রীরা বিরক্ত হয়, এমুন বয় আহে, তারা বলে, এবং আমরা আমাদের হাতের দিকে তাকাই, উল্টেপাল্টে দেখি, আমরা বুঝতে পারি যে, হাত না থাকলে আমরা বাঁচতে পারতাম না, হাত দিয়ে শুধু যে, কাজকর্ম করে বেঁচে থাকি, তাই নয়, হাত রক্ষা করা সহজ, হাত নিরাপদ দূরত্বে ঝুলে থাকে, নিজের ভার নিজেকে বহন করতে হয় না, পা-কে হয়, এবং পা-কে রক্ষা করা কঠিন, গর্তে পড়ে ভাঙে, কুকুর/সাপ কামড়ে দেয়, পা থাকার কারণেই আমিনুল হক মারা পড়ে; এবং এই খবর পাওয়ার পর আমরা তরমুজওয়ালার কাছে যাই, দুহাতের দশ আঙুল দ্রাঘিমা রেখার মতো ছড়িয়ে করতলের ভেতর একটি তরমুজ নিয়ে ফাঁকা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন বোঝার চেষ্টা করি, তখন আমাদের মনে হয় যে, সাপ এবং নারীর ভেতর একটা সম্পর্ক আছে, আমরা তরমুজওয়ালাকে তরমুজ সম্পর্কে অনেক জটিল প্রশ্ন করি, তরমুজ সারাবছর ধইরা হয় না ক্যালা, এবং আমাদের মনে হয় যে, এর একটা সমাধান দরকার; তখন আলি আকবর ব্যাপারির বাড়িতে মহল্লার প্রথম ফ্রিজ আসে এবং আমরা দল বেঁধে ফ্রিজ দেখতে গিয়ে ঠাণ্ডা পানি পান করি এবং এর গুণাবলীর কথা শুনি, তখন আমাদের মনে হয় যে, সারাবছর ধরে তরমুজ খাওয়া হয়তো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে, কিন্তু তা হয় না, আমাদের সমস্যা থেকে যায় এবং এই চিন্তা আমাদের মাথা থেকে বের হয় না, ফলে আমাদের মাথা ভার হয়ে থাকে; তখন আমরা নাইট শো-তে নিশাত সিনেমা হলে ছবি দেখতে যাই, নাগিনীর প্রেম, আমরা বুঝতে পারি যে, অনেক সাপ, নারী হয় এবং অনেক নারী,

সাপ; তখন আমরা পুলিশকে জিজ্ঞেস করি, তরমুজে ভেজাল হয় কিনা, কারণ, আমাদের মনে হয় যে, যদি তরমুজে ভেজাল হয়, তাহলে নারী, সাপ এবং সাপ, নারী হতে পারবে না কেন, পুলিশ আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয় না, আব্দুল গফুরের শূন্য বাড়ির ভেতর থেকে তার লাশ সংগ্রহ করে নিয়ে যায় এবং রহিমা বিবির এই বাড়িটি ভেঙে আমরা মসজিদ বানাই; কারণ, নারী সাপেরা সবসময় পুরুষদের ভালবাসে, নাগিনীরা প্রেম করে এবং প্রেমে পড়লে তারা ভয়ঙ্কর হয়ে যায়; আমরা বুঝতে পারি যে,আমিনুল হক এই ছবিটি দেখে নাই, কারণ, আমাদের মনে হয় যে, এটাই নিয়ম, যার জীবনে যা ঘটবে সে সে-বিষয়ে জানবে না, কিছু দেখবে না, তা না হলে ঘটনার আগে সকলেই সব কিছু জেনে যেত এবং ঘটনাই ঘটতে পারতো না; আমরা জানতে পারি যে, আমিনুল হকের জীবনে এক অর্ধেক নারী এবং এক পূর্ণাঙ্গ সাপ এসে দাঁড়ায়, আমরা বুঝতে পারি যে, দুজনেই আসে ফুলের গন্ধ এবং বাঁশির সুরের টানে, এবং আমাদের মনে হয় যে, এটাই স্বভাবিক ছিল, কারণ ফ্রিজের ভেতর তরমুজের বার মাসের বরাদ্দ ভরে রাখা সম্ভব নয়, ফলে আমাদেরকে পুনরায় অপেক্ষা করতে হয় হাজি আব্দুর রশিদের অসুস্থতার জন্য এবং বরাবরের মতো তিনি এবারও আমাদেরকে নিরাশ করেন না, আমরা তখন একদিন তার অসুস্থ হয়ে শয্যা গ্রহণের খবর পাই এবং ভাবি যে, এবার কিছু একটা হবে এবং কিছু একটা হয়; বিছানায় শুয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে গেলে তিনি তরমুজ খেতে চান, কিন্তু তখন তরমুজের মৌসুম ছিল না, তার পাঁচ ছেলে এবং তিন মেয়ের জামাই ঠাটারি বাজার, রায়সা বাজার, বাদামতলি, শ্যামবাজার ঘুরে খালি হাতে ফিরে আসে, মহল্লার সব ফ্রিজ খুঁজে দেখা হয়, তরমুজ পাওয়া যায় না; আমরা তখন খুব মন খারাপ করি, তখন শেফালি, অর্থাৎ শেফালি আখতার, যখন শেফালি এবং হাস্নাহেনা ফুলগাছ লাগায় এবং আমরা ফুলের গন্ধ পাই, এই গন্ধের তীব্রতা আমাদেরকে বিহবল এবং ভীত করে তোলে, কারণ, আমরা বুঝতে পারি যে, কোনো কিছুরই বেশি ভাল না, ফলে আমিনুল হকের ফেরার পথ থাকে না, সে দেয়ালের অন্য পাশে বাঁশির সুর এবং ফুলের গন্ধের ভেতর দাঁড়ানো নারীর খণ্ডিত অস্তিত্ব আবিষ্কার করে; তখন কোনো একদিন আমিনুল হক তার হাত প্রসারিত করে দিয়ে পুতুলের মুখ স্পর্শ করলে সে বুঝতে পারে যে, পুতুল নীরবে কাঁদে; আমরা যখন এইসব কথা শুনি তার কান্নার কারণ আমরা বুঝতে পারি, এবং আমরা হাজি আব্দুর রশিদের কথা শুনতে পাই, তার অসুস্থতা খারাপের দিকে এগোয়, তিনি দ্বিতীয় দিনও তরমুজ খেতে চান; কিন্তু যখন তরমুজ পাওয়া যায় না, তাকে তরমুজের মৌসুমি চরিত্রের কথা আমরা বলি,

তিনি আগেও এ কথা জানতেন, কিন্তু রোগশয্যায় শুয়ে এ কথা শোনার পর মনে হয় যেন এই প্রথম তিনি বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হন, তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়েন এবং তার ছেলেদের তার শয্যা পাশে ডেকে আনেন; তিনি বুঝতে পারেন যে, মানুষই যদি স্থায়ী না হয় তাহলে তরমুজের স্থায়ী হতে পারার উপায় নাই, কারণ, মানুষ এবং তরমুজ উভয়ই পচনশীল; আমরা তখন মানুষের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কের বিষয়ে সচেতন হই, আমিনুল হকের আঙুল যখন পুতুলের মুখের ভিজা তিল স্পর্শ করে, তার মনে হয়, হয়তো সে বুঝতে পারে যে, অশ্রু হচ্ছে গলে বয়ে যাওয়া হৃদয়, তখন হয়তো না জেনেই একটি পূর্ণ সাপের চাইতে অর্ধেক নারী তার কাছে শ্রেয়তর লাগে; সে হাস্নাহেনার ঝোপের কাছে তার বাঁশি ফেলে রেখে দেয়াল পার হয়ে আসে এবং অন্ধকারের ভেতর এই নারীকে বুকের ভেতর নেয়; আমরা পরে পুনরায় নিশাত, মুকুল অথবা শাবিস্তান সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখি, বেহুলা; এই বইয়ে নায়িকা সুচন্দা নায়ক লখিন্দর রাজ্জাককে সাপের কামড়ের পরও রক্ষা করে, আমাদের কাছে পুতুল বেগমকে বেহুলার মতো মনে হয়, কিন্তু আমিনুল হককে সে রক্ষা করতে পারে না, সম্ভবত প্রথম চুম্বন তার জীবনের শেষ চুম্বনে পরিণত হয়, কারণ, পরদিন ভোরে হাস্নাহেনার ঝোপের কাছে আমাদের মহল্লার বাঁশিবাদক আমিনুল হকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং আমরা শুনতে পাই যে, সে সাপের কামড়ে মারা যায়; আমরা পরে জানতে পারি যে, একটি সাপিনী প্রেমে কাতর ছিল এবং সাপিনীরা প্রেম ভাগ করে নিতে জানে না, আমিনুল হক যখন দেয়াল টপকে পুতুলের কাছে যায়, সে তখন হাস্নাহেনার ঝোপের কাছে অপেক্ষা করে; আমরা বুঝতে পারি যে, সাপিনীর এই প্রেম হয়তো একতরফা ছিল, এবং একতরফা প্রেম কতো প্রবল হতে পারে তা আমরা জানতে পারি, যখন পঞ্চম দিনেও তরমুজ না পেয়ে লোকজন খালি হাতে ফিরে আসে, হাজি আব্দুর রশিদ কাতর হয়ে কেঁদে ফেলেন, তারপর ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছে বলেন, আমি আর বাঁচুম না, এবং তিনি সত্যি আর বাঁচেন না; কিন্তু তার মৃত্যু আমাদের মহল্লায় আর এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে, দক্ষিণ মৈশুন্দিতে 'হাজি ফুড প্রডাক্ট কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয় কেবলমাত্র তরমুজ কৌটাজাত করার জন্য; আমরা এই কোম্পানির মালিক হাজি আব্দুর রশিদের বড় ছেলে হাজি রইসুদ্দিনের মুখে তার পিতার নির্দেশের কথা শুনি এবং আমরা বুঝতে পারি যে, মৃত্যুশয্যাতেও হাজি আব্দুর রশিদের চিন্তা করতে পারার ক্ষমতা পরিষ্কার ছিল, পাঁচবার তরমুজ খেতে চওয়ার পরও যখন তরমুজ পাওয়া যায় না, তখন তিনি সঙ্কটের গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেন এবং বড় ছেলে রইসুদ্দিনকে

বলেন, একটা তরমুজের ফ্যাক্টরি বসাও, তারপর তিনি মারা যান; আমরা তাকে পোস্তগোলা কবরস্থানে দাফন করে আসি, এবং বুঝতে পারি যে, এবার আমরা সারা বছর তরমুজ পাব, আমাদেরকে কৃষক এবং প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বসে থাকতে হবে না; তখন আমাদের মহল্লার দক্ষিণ প্রান্তে পড়ে থাকা এক টুকরো খালি জমি হাজি রইসুদ্দিন কিনে ফেলে এবং এই জায়গায় হাজি ফুড কোম্পানির ফ্যাক্টরি তৈরির কাজ শুরু হয়, আমরা তখন হাজি রইসুদ্দিনের বাসায় যাই এবং সে আমাদেরকে বিস্তারিত পরিকল্পনার কথা বুঝিয়ে বলে, আমরা জানতে পারি যে, তরমুজ কাটা, বাছাই ও পরিষ্কার করা, তারপর জীবাণুমুক্ত অবস্থায় কৌটাজাত করার ব্যবস্থা হবে ফ্যাক্টরিতে এবং এখানে আমাদের মহল্লার ১৫/২০ জন কাজ পাবে; তখন পুনরায় ইট এবং বালু এনে ফেলা হলে মহল্লার বালকেরা বালুর ভেতর লাফালাফি করে এবং আমরা মৃত হাজি আব্দুর রশিদের কথা ভুলতে পারি না, আমরা চিৎকার করে উঠি, এই শেপালি ফুল গা-ছ, আমরা তাকে আর পাই না, আমরা তাকে হারাই,

***১৯৯৫***

## অনুক্রমণিকা ঃ
## 'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস'
## পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে

'আমাদের কুটির শিল্পের ইতিহাস' গল্পটি একটিমাত্র অনুচ্ছেদে রচিত, অন্তিমে পূর্ণচ্ছেদসূচক-যতিচিহ্ন বিহীন এবং উন্মুক্ত বা খোলা। গল্পটা 'মাটি' নামক সাময়িকীতে এভাবেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটাই শুদ্ধ পাঠ। এ বিষয়টি ছাড়া এই সঙ্কলনে গল্পটির আর কোন প্রকারের সংশোধন বা পরিমার্জনা করা হয় নাই। কেবলমাত্র একটি শুদ্ধ পাঠ নিশ্চিত করার জন্য গল্পটা পুনমুর্দ্রণ করা হলো।

*শ.জ.*

আমারবই.কম amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও !

Amarboi.com
Like 814

Say Thanks to Humayun Ahmed at **www.humayunahmed.org**



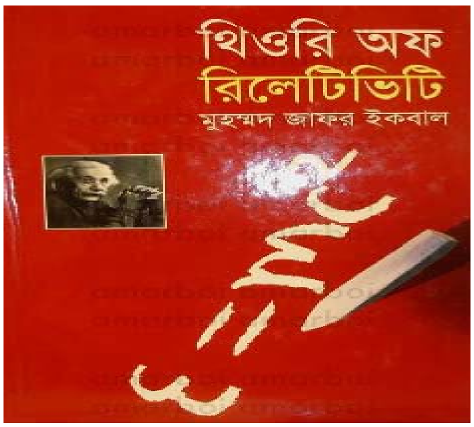


## থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

30 Nov 2011 | 1 comments

// থিওরি অফ রিলেটিভিটি E=mc[2]মুহম্মদ জাফর ইকবাল You can follow us ... *Read more*

## আলোচিত বইগুলি

- Dec/01পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- Dec/01হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন
- Dec/01Winner of Amazon Gift Card
- Nov/30থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল
- Nov/26তিন ডব্লিউ - হুমায়ূন আহমেদ
- Nov/26অর্ধেক জীবন - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- Nov/25AmarBoi Gets Google+ Page. Join. Win A Amazon.com Gift Card!
- Nov/23তেল দেবেন ঘনাদা - বাংলা সম্পূর্ণ কমিক
- Nov/22বৃক্ষকথা - হুমায়ূন আহমেদ
- Nov/19কচ্ছপকাহিনি হুমায়ূন আহমেদ

আরোও আছে

## জনপ্রিয় বইগুলি

- হিমু এবং হার্ভার্ড পিএইচডি বল্টুভাই - হুম আহমেদ
- থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ই
- মিসির আলি বিষয়ক রচনা যখন নামিবে ত
- প্রডিজি - মুহাম্মদ জাফর ইকবাল [বইমেলা
- একটি সাইকেল এবং কয়েকটি ডাহুক পা আহমেদ
- মেঘের উপর বাড়ি (২০১১ ঈদ) হুমায়ূন আ
- হুমায়ূন আহমেদ এবং হুমায়ূন আহমেদ
- শার্লক হোমস গল্প সংগ্রহ
- রাতুলের রাত রাতুলের দিন - মুহম্মদ জাফ
- বৃক্ষকথা - হুমায়ূন আহমেদ

## বাংলা বই

পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন

**Winner of Amazon Gift Card**

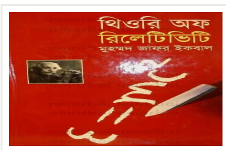

থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

Subscribe To Get F Books!

enter your email address...

subscribe

## আলোচিত বই

### থিওরি অফ রিলেটিভিটি - মুহম্মদ জাফর ইকবাল

30 Nov 2011 | 1 comments

// থিওরি অফ রিলেটিভিটি E=mc[2]মুহম্মদ জাফর ইকবাল You can follow us ...*Read more*

RECENT POSTS | COMMENTS

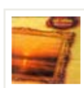

পূর্ব পশ্চিম (অখন্ড) - সুনীল গঙ্গো

01 DEC 2011

হাঙ্গর নদী গ্রেনেড - সেলিনা হোসেন

01 DEC 2011